ভে তে রে
কর্পোরেট ও সাম্প্রদায়িক খুনে দস্যুদের ২
ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন ৩
তৃণমূল কংগ্রেস ও অপরাধ জগৎ ৪
... মজুরি নিয়ে নীরব, কাজের নামে ধাপ্পা ... ৫
'তৃতীয় ফ্রন্ট' ... নির্লজ্জ সুবিধেবাদ ... ৬
ইউক্রেন ঃ রুশ-মার্কিন দ্বৈরথ ... ৭

আজকের দেশব্রতী

₹ ২

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২১ সংখ্যা ৮ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ২০ মার্চ ২০১৪

লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ৫টি আসন সহ সারা দেশে ৮৪টি আসনে

সি পি আই (এম এল) লিবারেশন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে

১। কেন্দ্রীয় কমিটির ভুবনেশ্বর বৈঠকে (১৩-১৫ ডিসেম্বর) সারা দেশে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলোতে কেন্দ্র ও প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করা হয়। পার্টির পলিটব্যুরোর ১-২ মার্চ ২০১৪ পাটনা বৈঠকের পর সারা দেশে পার্টির পক্ষ থেকে ৮৪টি কেন্দ্রে এবং সারা ভারত বাম সমন্বয়ের শরিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে আরও ৫-৬টি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। যে রাজ্যগুলোতে আমরা সংশ্লিষ্ট রাজ্যের লোকসভা ও বিধানসভা আসনের ১০ শতাংশ প্রার্থী দিয়েছি, সেই সমস্ত কেন্দ্রগুলোতে আমাদের পার্টির প্রার্থীরা **"পতাকায় তিন তারা"** প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আসানসোল বৈঠকে (২৬-২৭ ডিসেম্বর) যে ৫টি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করা হয়, কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরো বৈঠক তাকে অনুমোদন দিয়েছে। কেন্দ্রগুলো ও প্রার্থীদের নাম—

কেন্দ্র		প্রার্থীর নাম	নির্বাচনের তারিখ
কৃষ্ণনগর	—	**কমরেড সুবিমল সেনগুপ্ত**	**১২ মে**
হুগলী	—	**কমরেড সজল অধিকারী**	**৩০ এপ্রিল**
বর্ধমান পূর্ব (তপশিলি)	—	**কমরেড পীযূষ সাহানা**	**৩০ এপ্রিল**
বারাকপুর	—	**কমরেড ওমপ্রকাশ রাজভর**	**১২ মে**
বাঁকুড়া	—	**কমরেড সুধীর মুর্মু**	**৭ মে**

দার্জিলিং কেন্দ্রে সি পি আর এম কোন প্রার্থী দিলে আমাদের পার্টির তরফে তাঁকে সক্রিয় ও পূর্ণ সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে দল-বদলের কারণে একই সাথে কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় কমিটি অনুমোদন দেওয়ার পর **ময়নাগুড়ি (তপশিলি) কেন্দ্রে (জলপাইগুড়ি জেলা) বিধানসভা আসনে** আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। ১৭ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের প্রার্থী **কমরেড রূপেশ্বর রায়**।

২। কেন্দ্রীয় কমিটির বিগত বৈঠকে ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন ও জাতীয় রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে আমাদের পর্যালোচনা ও অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে। কর্পোরেট মদতপুষ্ট সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট শক্তি বিজেপি এবং এন ডি এ কেন্দ্রীয় ক্ষমতালাভের লক্ষ্যে আগ্রাসী প্রচারাভিযান শুরু করেছে। ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও দাঙ্গা লাগাতে তারা পিছপা নয় (মুজফফরনগর তার অন্যতম উদাহরণ)। প্রচার মাধ্যমকে হাতিয়ার করে ও তথাকথিত জনমত সমীক্ষার মাধ্যমে নরেন্দ্র মোদীর নামে হাওয়া তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার ও তার শরিক দলগুলো বিশেষত জাতীয় কংগ্রেস দল হতোদ্যম, উদ্যোগহীন, দিশেহারা। আপাদমস্তক দুর্নীতিতে লিপ্ত ইউ পি এ জোট সরকার বিগত বছরগুলোতে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, বেকারীর অবসান, দুর্নীতিগ্রস্তদের কঠোর শাস্তি, কৃষকদের আত্মহত্যা রোধ, খাদ্য সুরক্ষা প্রদান ইত্যাদি প্রশ্নে কোন ন্যূনতম সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণের বিপরীতে কর্পোরেট স্বার্থে কৃষকের জমি গ্রাস, কর্পোরেট শক্তিগুলোকে কোটি কোটি টাকার ভর্তুকি এবং অবাধে জল-জঙ্গল-জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠের অবাধ ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে। কয়েকমাস আগে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই গণক্ষোভ আছড়ে পড়েছে।

৩। এই অবস্থায় বাম ও গণতান্ত্রিক দল তথা শক্তিগুলোর ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে সি পি এম-সি পি আই তথাকথিত যে তৃতীয় ফ্রন্ট ও তৃতীয় বিকল্পের মরীচিকার পেছনে ছুটেছে তা ইতিমধ্যেই গুরুতর ধাক্কার মুখে। এ আই ডি এম কে, অগপ, বিজেডি তৃতীয় ফ্রন্ট/বিকল্পের থেকে সরে গেছে। একইভাবে মমতা ব্যানার্জীর তথাকথিত ফেডারেল ফ্রন্ট হাওয়াই কথাবার্তাতেই সীমাবদ্ধ। দিল্লীতে আন্না-মমতা ব্যানার্জী ফ্লপ-শো তৃণমূল কংগ্রেসের উচ্চাশাকে জোর ধাক্কা দিয়েছে।

৪। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিকাজ হিসাবে জেলা জমায়েত, গণসম্পর্ক অভিযান, কেন্দ্রভিত্তিক জনসভা, বাড়ী বাড়ী প্রচার, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে জোরালো প্রচারাভিযান, গণকনভেনশন,

চারের পাতায় দেখুন

সফল হল সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির ৯ম রাজ্য সম্মেলন

নারীর নির্ভয় স্বাধীনতা এবং অপরাধীদের দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সারা ভারত প্রগতিশীল মহিলা সমিতির ৯ম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ঐতিহ্যমণ্ডিত ও তাৎপর্যময় দিনে। সম্মেলন হয় কলকাতার ভারত সভা হলে "অপরাজিতা মঞ্চে"। পতাকা, ব্যানার, পোস্টার ও অঙ্কনচিত্রে সম্মেলন কক্ষ ছিল সুসজ্জিত। উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ। এসেছিলেন "আশা", রন্ধনকর্মী, পরিচারিকা, আয়া, চা-বাগানের কামিন, কৃষিমজুর সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমজীবী নারীরা; ছিলেন গৃহবধু, ছাত্রী এবং যৌন হিংসার শিকার নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যরা। সম্মেলন হয়েছে উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরপুর। উপস্থিত ছিলেন পার্টির রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ, এ আই সি সি টি ইউ-র রাজ্য নেতৃবৃন্দ বাসুদেব বসু ও মীনা পাল এবং ছাত্র সংগঠন আইসার নেতা ও কর্মীবৃন্দ।

সমিতির পতাকা উত্তোলন এবং শহীদবেদীতে মাল্যদান ও পুষ্প অর্পণের মাধ্যমে শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠান পর্ব দিয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন বর্ষীয়ান নেত্রী গৌরী দে। মাল্যদান করেন জাতীয় পর্যবেক্ষক কবিতা কৃষ্ণাণ এবং রাজ্য ও জেলা স্তরের নেত্রীবৃন্দ এবং ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলোর নেতৃত্ব। নীরবতা পালনের মাধ্যমে শহীদদের স্মরণ করা হয়। এই পর্বটি পরিচালনা করেন কমরেড মমতা ঘোষ।

সভানেত্রীমণ্ডলী ও সঞ্চালনা কমিটি গঠনের পর গণসঙ্গীত গেয়ে শোনান মীরা চতুর্বেদী ও আকাশ দেশমুখ। জাতীয় পর্যবেক্ষক প্রগতিশীল মহিলা সমিতির জাতীয় সম্পাদিকা কবিতা কৃষ্ণান উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। তিনি নারীর স্বাধীনতা, মর্যাদা ও অধিকারের জন্য নারী আন্দোলনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে অর্ধেক আকাশের এই মর্যাদা, স্বাধীনতা ও অধিকারের এ্যাজেণ্ডাকে ঘোষণা করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন তিনি। যে আইন মহিলাদের স্বাধীনতা হরণ করে এবং ধর্ষকদের রক্ষা করে সেই কানুনকে বাতিল করার দাবি জানান। তিনি বলেন, যারা ন্যায় এবং নারীর স্বাধীনতার সপক্ষে কেবলমাত্র তারাই সংসদে জনতার প্রতিনিধি হতে পারেন। এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর প্রতি আন্না হাজারের সমর্থনকে কবিতা কৃষ্ণান নারী আন্দোলনের পক্ষে অবমাননাসূচক বলে ব্যাখ্যা করেন। রাজ্যজুড়ে ধর্ষকদেরকে মোকাবিলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ও তাঁর সরকার নির্লিপ্ততা ও অপদার্থতা দেখাচ্ছেন, ধর্ষণকে অবাধ করছেন, চিটফাণ্ড কেলেঙ্কারির মত দুর্নীতির কাণ্ডগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। যার ফল হিসাবে গ্রামীণ গরিব মহিলারা আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। আসলে এ রাজ্যেও নারীর স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র অর্জন সম্ভব নয় যদি না পুরুষতন্ত্রের রক্ষক ও প্রতিভূদের বিরুদ্ধে লড়াই তীব্রতর করা যায়।

রাজ্য সম্পাদিকা চৈতালি সেন খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন। এ রাজ্যে ক্রমবর্ধমান নারী

সম্মেলন সফল হওয়ার বার্তা নিয়ে মধ্য কলকাতার জনপথে মহিলাদের মিছিল।

নির্যাতন ও ধর্ষণের বাড়বাড়ন্তকে চিহ্নিত করে এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন ঘটনায় ন্যায় বিচারের দাবিতে প্রগতিশীল মহিলা সমিতির বহুবিধ উদ্যোগের কথা এবং শ্রমজীবী নারীদের শ্রমের অধিকার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলনের কথা তুলে ধরা হয়েছে। মহিলাদের সেক্টর ভিত্তিক কাজের অভিজ্ঞতা ও পঞ্চায়েতে ভূমিকারও উল্লেখ রয়েছে প্রতিবেদনে। বিভিন্ন জেলায় জেলা কাঠামো গড়ে তোলা ও সক্রিয় করা, নারী আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে কাজের জেলাগুলোতে গণজমায়েত ক্ষমতা বাড়ানো, নারী আন্দোলন ও সেক্টর ভিত্তিক কর্মশালা করা এবং ২০১৪-র নির্বাচনে মহিলা সমিতির সক্রিয় অংশগ্রহণ ইত্যাদি

ছয়ের পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয়

সাধ না মিটিল আশা না পূরিল

যাকে বলে বোধনেই বিসর্জন। সেটাই ঘটে গেল। ঘটল দিল্লীর রামলীলা ময়দানে। যে স্থানটি রাজনীতির বহু লীলা প্রদর্শনের নজীর রাখা, এবার সেখানেই যুগলে নজরকাড়া লীলা সূচনা করার বড় সাধ হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেসের। সে বাঁশীতে সাড়াও দিয়েছিলেন প্রথমে স্বঘোষিত এক সামাজিক মঞ্চ চালানো আন্না হাজারে। কথায় কথায় 'চুক্তি' হয়েছিল আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসকে জাতীয় রাজনীতিতে বিশেষ কব্জে পাওয়াতে হবে। তার জন্য একটা মিতালীর ছবি দেখানো প্রয়োজন। উভয়পক্ষ সাংবাদিক সম্মেলনে সেটা বড় গলায় বলেছিলেন। বিশেষ গরজটা ছিল তৃণমূলের, কারণটা সহজবোধ্য, গুলিয়ে দেওয়ার নয়, কারণ তৃণমূল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী, আন্নার দল নয়। মমতার দল তাই মরীয়া হয়েছিল রামলীলার সভাকে সফল করতে। অন্যদিকে আন্নার দলের যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্বার্থ নেই, আর কেজরিওয়ালদের সাথে বিচ্ছিন্নতা ঘটে যাওয়ার পর আন্নার লোকবল বলতে যেহেতু বিশেষ কিছু নেই, তাই তাদের পক্ষে আঁতাতের জন্য কোনোকিছুই উজাড় করে দেওয়ার ছিল না। তৃণমূল নেত্রী যে এসবের বুঝদার নন তা নয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাইরে যখন কোথাও কোনও আঁতাতের শরিক মিলছে না, তখন আন্না মঞ্চকেই বহিরঙ্গে বাজী ধরতে চেয়েছিল। কিন্তু যে কোন গূঢ় কারণেই হোক, শরীর খারাপের অজুহাতে আন্না সভায় এলেন না, সভায় লোক সমাগম মার খেল, অল্প বিস্তর লোকের মাঝে তৃণমূলনেত্রী সভামঞ্চে উঠলেও, আঁতাতের বোধনের বাজনা বেজে ওঠার মধ্যেই বিসর্জনের বাজনা শোনা গেল। সংবাদ জগত যাকে ''ফ্লপ শো'' বলল তার দায় অস্বীকার করতে গিয়ে তৃণমূলকে ধূর্তামীর আশ্রয় নিতে দেখা গেল। একদিকে লোক না হওয়ার দায় আন্নার দলের উপর চাপিয়ে, অন্যদিকে তৃণমূল একাই লড়বে জানান দিয়ে। ওদিকে মুখরক্ষার জন্য আন্না অবশেষে এমনকি এতদূর পর্যন্তও মন্তব্য করলেন—'মমতা ভাল, কিন্তু তৃণমূলের দায় নেওয়া সম্ভব নয়।' আন্নার মন্তব্যের জোরালো প্রতিক্রিয়া দিতে তৃণমূলনেত্রী ব্যর্থ হয়েছেন। খুঁচিয়ে আন্নাকে চটানো থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছেন ব্যুমেরাং হওয়ার ভয়ে। কিন্তু রামলীলা ময়দানের আয়োজন 'ফ্লপ-শো'-তে পরিণত হওয়ার ধাক্কা কোনও বুলিতেই আড়াল করা সম্ভব হয়নি। মিতালী পাতাতে গিয়ে মুখ পুড়েছে। আন্নাকে নিয়ে গুজরাট থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে রাজ্যে যুক্ত সফরের রাজনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। ঐ পরিকল্পনায় ইতি টানতে হয়েছে। তৃণমূলী সর্বভারতীয় উদ্যোগ এক ঝট্‌কার প্রতিক্রিয়ায় এখন ঘরমুখো। আর, ঘরে ফিরে তৃণমূলনেত্রীকে প্রথম বার্তাটি দিতে হল জনতার উদ্দেশ্যে নয়, দলের মধ্যে গোষ্ঠী সংঘাত বন্ধ করার তাগিদে। এটা উপর্যুপরি দুর্বলতা বৃদ্ধির পরোক্ষ স্বীকারোক্তি। আর সেটা আরও বেশী প্রকাশ হচ্ছে রামলীলা দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পরপরই। ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে টি এম সি প্রচারে দাবি করছে, এ রাজ্যে বিরাট সাফল্য আসবে। কিন্তু তৃণমূল রাজত্বে এমন বেশ কিছু ঘটনা-পরিঘটনা সংঘটিত হয়ে চলেছে যার জের তৃণমূলকে বইতে হচ্ছে। পরিস্থিতি রাজ্যের শাসক দলের সপক্ষে কয়েক বছর আগের মতো পুরোপুরি ফুরফুরে নয়, বরং তাকে অনেক প্রতিকূলতার মুখোমুখিও হতে হচ্ছে। দেখা যাক, সামনের দিনগুলোর কীভাবে সম্মুখীন হয়। পরিস্থিতি আরও কী লীলা প্রদর্শনের অপেক্ষায় কে বলতে পারে!

কর্পোরেট ও সাম্প্রদায়িক খুনে দস্যুদের মোকাবিলায় উঠে দাঁড়ান

লোকসভা নির্বাচনের একমাসও বাকি নেই যখন আমরা সর্বত্রই এক মরিয়া রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাসকে দেখতে পাচ্ছি। এখন সুবিধাবাদীদের জন্য এ হল এক খোলা ময়দান, যেখানে আয়ারাম-গয়ারাম রাজনীতিকরা অত্যাশ্চর্য গতিতে দলবদল করে চলেছে।

রাজ ঠাকরের মহারাষ্ট্র নির্মাণ সেনা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মোদীকে সমর্থন জানিয়েছে। তারা বিজেপির সহযোগী শিবসেনার বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবে, কিন্তু বিজেপির বিরুদ্ধে দেবে না।

মোদীর অভিযান নানা ধরণের কলুষিত বিভিন্ন শক্তির এক যুক্তমোর্চার রূপ গ্রহণ করেছে ঃ এখানে রয়েছে সাম্প্রদায়িক আর এস এস এবং তার শাখা-প্রশাখা এবং নৈতিক পুলিশ বাহিনী, দাভোলকরের হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত সংগঠন, রাজ ঠাকরে ও শিবসেনার মতো আঞ্চলিক-জাতিদম্ভী সংগঠন, খাপ পঞ্চায়েত ও কর্পোরেট ঘরানা সহ নানা ধরণের খুনে দস্যু। এই দলের মধ্যে রয়েছে রামদেব ও শ্রী শ্রী রবিশঙ্করের মতো গডম্যানরা (এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে জেলে থাকার ফলে আসারাম অবশ্য এই দলের বাইরে থেকে গেছে)। যারা সময় মতো রণনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং দস্যুদের এই দলে যোগ দিয়েছে সেই সমস্ত সুবিধাবাদীদের মধ্যে আমরা সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন সরকারকেও ধরতে পারি, যারা নিজেদের অবস্থানকে পুরোপুরি পাল্টে মোদীর প্রতি নীরব আশীর্বাদ বর্ষণ করেছে।

প্রকৃতপক্ষে মোদীর প্রচারের বিষয়বস্তুই হল 'থিম গুজরাট' ও 'টিম গুজরাট' এবং মোদীর প্রধানমন্ত্রীত্ব পদের অভিযানে গুজরাট সরকারের সম্পদকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন শিবসেনা ছাড়াও রাজ ঠাকরের সমর্থনের ফলে ইন্ধন শক্তি হিসেবে গুজরাটের সঙ্গে মহারাষ্ট্র যুক্ত হয়ে যেতে পারে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্র উভয়েই হল কর্পোরেট দাপটের ও কর্পোরেট মডেলের উন্নয়নের পীঠস্থান এবং মোদীর প্রচারে তুলনামূলক পশ্চাদপদ অঞ্চলগুলোর জন্য কর্পোরেট অভিযানের সুরই বেজে উঠেছে। মোদী ইঙ্গিতে ঘোষণা করেছেন যে বাম এবং অ-কংগ্রেসী অ-বিজেপি পার্টির দ্বারা শাসিত 'পূর্বাঞ্চল-এর রাজ্যগুলো'কে 'উন্নত পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলো'র পাশে টেনে আনা দরকার। এটা পরিহাসের ব্যাপার যে, 'পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলোর' উন্নয়নের মডেল নিয়ে বিহারের জনগণের প্রতি দম্ভোক্তি করার সময় মোদী ভুলে গেছেন যে মহারাষ্ট্রে তার নিজেদের রাজনৈতিক সঙ্গীরা পূর্ব-ভারত থেকে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকদের পিটিয়ে তাড়িয়েছিল। আর এই রাজ্যগুলোতে কর্পোরেট চালিত 'উন্নয়ন'-এর পিছনে এই শ্রমিকদের অবদান কোন কিছু কম নয়।

এই সাম্প্রতিক পুনর্বিন্যাসে সি পি আই (এম) এবং সি পি আই-এর ফেরী করা 'তৃতীয় ফ্রন্ট'-এর দায়হীন ও ফাঁপাপনাও প্রকাশ পাচ্ছে। ১০ ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে ১১ পার্টির বৈঠকের পর একমাসের মধ্যেই ফ্রন্ট নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছে। সি পি আই (এম)-কে অসহায় অবস্থার মধ্যে ফেলে এ আই এ ডি এম কে ঠাণ্ডা মাথায় বেরিয়ে যায়, কেননা জয়ললিতা নির্বাচন পরবর্তীতে পরিস্থিতি অনুযায়ী মোদীকে (বা মমতাকে) সমর্থন করার রাস্তা খোলা রাখতে চান। স্পষ্টতই যাদের ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক নীতি নেই বা বিন্দুমাত্র দৃঢ়তা নেই এমন পার্টিগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে তৈরি করা এই ধরণের এক ফ্রন্ট বিজেপিকে কোন মাত্রাতেই প্রতিরোধ করতে পারবে না। অন্যান্য রাজ্যের মতো বিহার ও উড়িষ্যাতেও জে ডি ইউ এবং বিজেডির সঙ্গে আসন বোঝাপড়ায় সি পি আই (এম), সি পি আই-কে হতাশ হতে হয়েছে। এই ধরণের ঘটনাগুলো সি পি আই (এম) এবং সি পি আই-এর জন্য কিছু শিক্ষা বহন করে। মাঝেমধ্যে 'ধর্মনিরপেক্ষ ফ্রন্ট', 'ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচী' বা 'তৃতীয় ফ্রন্ট'-এর মোড়কে অন্তর্বস্তুতে সুবিধাবাদী জোটের এই মডেল নয়া উদারনৈতিক নীতি ও সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে কেবলমাত্র মর্যাদাহীন ও কলঙ্কিত করেনি, তা বামেদের শক্তির প্রান্তিকীকরণ ও মর্যাদার ক্ষয়ও ঘটিয়েছে। এই ধরণের জোটের মাধ্যমে সি পি আই (এম) এবং সি পি আই-এর কিছু আসন পাওয়ার ঘটনা বামেদের শক্তির প্রান্তিকীকরণ ও মর্যাদার ক্ষয়কে চাপা দিয়ে রাখতে পারলেও সময়ের সাথে সাথে তা স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে।

কর্পোরেট ও সাম্প্রদায়িক খুনে দস্যুদের মোকাবিলা করতে আমরা সেই সমস্ত রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের ওপর নির্ভর করতে পারি না যারা কর্পোরেট লুণ্ঠনকে মদত জোগায় এবং যাদের কোন সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দৃঢ় নীতি ও অনুশীলন নেই। এই ধরণের সুবিধাবাদী ও অনীতিনিষ্ঠ শক্তি ও তাদের জোটের ওপর নির্ভর না করে বাম ও জনগণের আন্দোলনের শক্তিগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, জনগণের অধিকার ও জনবিরোধী নীতি প্রত্যাহারের ইস্যুগুলোকে জোরের সঙ্গে সামনে আনা প্রয়োজন।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ১২ মার্চ ২০১৪)

শতবর্ষ উদযাপন শ্রদ্ধার্ঘ

কমরেড সরোজ দত্ত এক আদর্শ বিপ্লবী পথিকৃৎ

''৭০ দশকের বিপ্লবী উন্মাদনা, কমরেড সরোজ দত্ত-চারু মজুমদারের ঐতিহ্য আমাদের কাছে কেবলমাত্র স্মৃতিচিহ্ন নয়, একে আমরা যাপন করি আমাদের প্রতিদিনের অনুশীলনে-মননে। শতবর্ষ উদযাপন সেই উত্তরাধিকারকে নতুন করে উর্ধ্বে তুলে ধরতে উদ্বুদ্ধ করে।'' কমরেড সরোজ দত্তর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের দিশামুখকে এভাবেই তুলে ধরলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অভিজিৎ মজুমদার। গত ১৩ মার্চ সরোজ দত্তর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের সূচনা হল ধর্মতলায় তাঁর আবক্ষ মূর্তির সামনে এক প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। শুরুতে মাল্যদান করেন পার্টির পলিটব্যুরো সদস্য কার্তিক পাল, রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অভিজিৎ মজুমদার, প্রাবন্ধিক কিন্নর রায়, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের সম্পাদক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; মাল্যদান করেন রাজ্য কমিটির সদস্য বাসুদেব বসু, সুবিমল সেনগুপ্ত, সুব্রত সেনগুপ্ত, সজল পাল, ইন্দ্রাণী দত্ত, মীনা পাল, দেবব্রত ভক্ত, কৃষ্ণ প্রামানিক, ধীরেশ গোস্বামী, দিবাকর ভট্টাচার্য, অতনু চক্রবর্তী; গণ সংস্কৃতি পরিষদের নীতীশ রায়, অমিত দাশগুপ্ত, অরিন্দম সেনগুপ্ত; কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য অমলেন্দু চৌধুরী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। অভিজিৎ মজুমদার স্মৃতিচারণায় তার বাল্যকালে সরোজ দত্তের সাথে ঘনিষ্ঠতার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, অদ্ভুত রসিক ও প্রাঞ্জল মানুষ ছিলেন তিনি। সরোজ দত্ত হত্যার তদন্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার এই তদন্তকে সুনির্দিষ্টভাবে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, অবশেষে রাষ্ট্রের নির্দেশেই একে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কয়েক দশক ধরে কমরেড সরোজ দত্ত-চারু মজুমদারেরা বিভিন্ন রচনা ও তাত্ত্বিক কাজের মধ্য দিয়ে নকশালবাড়ি সৃষ্টি করেছিলেন। আজকের দিনে রাজনৈতিক সঙ্কট যত বেশী বাড়বে সম্ভাবনাগুলোও তত সামনে আসবে। সরোজ দত্তের 'দুঃসাহস' আমাদের প্রেরণা—একে বুকে ধরেই পথ চলতে হবে।''

পলিটব্যুরো সদস্য কার্তিক পাল বলেন, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কি ধরণের ঘৃণা থাকলে রাষ্ট্র এমন হিংস্র হয়ে একজন বিপ্লবীকে শেষ করে দেয় সরোজ দত্ত তার প্রমাণ। তিনি মৃত নন আজও জীবন্ত। তাঁর স্বপ্ন সফর করে তুলতে আমাদের সংকল্পবদ্ধ হতে হবে, হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিকে জীবন্ত রাখতে হবে। প্রাবন্ধিক কিন্নর রায় বলেন, মানুষের আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে রাষ্ট্র বারবারই এ ধরণের হত্যা করবে। আমাদের সতর্কতা জারী রাখতে হবে। হাতে হাত রেখে তদন্ত ও বিচারের দাবি তুলে ধরতে হবে। রাজ্য সম্পাদক পার্থ ঘোষ বলেন, সারা দেশের সামনে আজ বড় বিপদ—গণহত্যাকারীরা ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছে। তাই '৭০ দশকের গণহত্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম আজও জারী রাখতে হবে। অনুদান-পারিতোষিক বিলিবন্টনের মধ্য দিয়ে এ রাজ্যের শাসকরা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করছে; এই অবস্থায় '৪০-এর দশকে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের মধ্যকার যে বিতর্ক—বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিক কৃষকের পক্ষে কলম ধরবে কিনা, অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবে কিনা, তা আজকের সময়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই বিতর্কে সরোজ দত্তের শিক্ষা পথিকৃৎ-এর ভূমিকা নেবে। নীতীশ রায় বলেন, প্রতিষ্ঠান আজ যখন শিল্পীদের কিনে নিচ্ছে তখন সরোজ দত্ত আমাদের প্রেরণা। তিনি গেয়ে ওঠেন ''আলু বেচো, ছোলা বেচো ... লাল টুকটুকে স্বপ্ন বেচো না''। এই গানের সূত্র ধরেই নবান্ন পত্রিকার সম্পাদক অমিত দাশগুপ্ত বলেন, যিনি এই গানটির রচয়িতা তাকেই এখন গানটি শোনানো প্রয়োজন, কারণ তিনি নিজেই সেই পথের পথিক। এখন পুরস্কার গ্রহণের লাইনে যেন হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা অসহ্য-কর্কশ মনে হলেও সরোজ দত্ত-র বিতর্ক আরেকবার তোলা দরকার। স্বৈরাচারী শাসককে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইকন হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে, এদের ইমেজ খসিয়ে দেওয়ার জন্য বিতর্কের নেতৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে সরোজ দত্তকে নিয়ে আসতে হবে। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক-শিক্ষাবিদ সলিল বিশ্বাস নতুন প্রজন্মের কাছে সরোজ দত্তকে তুলে ধরা, বিপ্লবী সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাসকে ছাত্র সমাজের কাছে পুস্তিকা আকারে নিয়ে যাওয়ার ওপর জোর দেন। ছাত্র আকাশ-প্রতীক যুগলের কণ্ঠে গান অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। শান্তনু ভট্টাচার্যের গান ৭০ দশকের স্পিরিটকে তুলে ধরে। সরোজ দত্তর প্রতিকৃতি অঙ্কন, তাঁর কবিতার ছত্র লিখন এবং সেগুলোর উপর ছবি এঁকে মূর্তিস্থলটি সুসজ্জিত করে তোলে শিল্পী কল্লোল ও বাবুনি মজুমদার। সরোজ দত্ত একজন বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক হয়েও সংবাদপত্রের ছাপাখানার শ্রমিকদের পাশে কিভাবে দাঁড়িয়েছিলেন সেই কথা তুলে ধরেন রাজ্য কমিটির সদস্য বাসুদেব বসু। সরোজ দত্তর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে—এই ঘোষণা করেন সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালক জয়তু দেশমুখ।

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন ও আমাদের কর্তব্য

১৯৩৫ সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে জর্জ ডিমিট্রভ যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন, তা দিয়েই আমাদের কথা শুরু করা যাক—

''ফ্যাসিবাদ আসলে জনসাধারণকে দুর্নীতিগ্রস্ত এবং জঘন্য চরিত্রের লোকজনদের মুখে ঠেলে দেয়, কিন্তু তাদের সামনে হাজির হয় 'একটি সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত সরকারের' দাবি নিয়ে।'' ১৯৩০ বা ৪০-এর দশকে জার্মানীতে হিটলারের 'জাতীয় সমাজতন্ত্র' (ন্যাশনাল স্যোসালিজম)-এর শ্লোগানের আড়ালে লুকিয়ে ছিল ''এক হিংস্র, প্রতিক্রিয়াশীল, উগ্রজাতিদম্ভ সম্পন্ন নগ্ন সন্ত্রাসবাদী একনায়কতন্ত্রের'' শাসন ক্ষমতা দখলের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। 'রাইখস্ট্যাগে' (জার্মান পার্লামেন্ট) আগুন লাগিয়ে কমিউনিস্ট, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল শক্তির ওপর হিংস্র আক্রমণের যে নগ্ন অভিযানের সূচনা হয়েছিল, তার পরিণতি আমরা দেখেছিলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংস লীলার উন্মাদনায়। বিশ্বজোড়া সচেতন মানুষ সে ইতিহাসকে কখনো ভুলতে পারেনি। ১৯৩০-এর দশকে বিশ্বজোড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও অর্থনীতির যে মহাসংকট (মহামন্দা) ফ্যাসিবাদকে গড়ে তুলেছিল, আজ প্রায় ৭০-৮০ বছর পরে ভারতের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতির তীব্র সংকটের মুহূর্তে গুজরাট গণহত্যার নায়ক নরেন্দ্র মোদীকে সামনে রেখে বিজেপি ও সংঘ পরিবার এবং তার শাখা-প্রশাখা দিল্লীর ক্ষমতার মসনদ দখলে উঠে-পড়ে লেগেছে। ১৯৩০ বা ১৯৪০-এর জার্মানির সঙ্গে কোন তুলনা না টেনেও বলা যায়, আজ ভারতীয় গণতন্ত্রের চরম পরীক্ষার দিন। শুধুমাত্র ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়, ভারতের শ্রমিকশ্রেণী, মেহনতী কৃষক সমাজ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রগতিশীল মানুষজনকে এই সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্ট, কর্পোরেট মদতপুষ্ট, মিডিয়া দ্বারা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলা এই ঘৃণ্য শক্তি ও তার আগুয়ান প্রতিনিধি নরেন্দ্র মোদী ও তার দলবলের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে ওদের মুখোশটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে বিপ্লবী বামপন্থী শক্তির রাজনৈতিক প্রচারাভিযান ও সাংগঠনিক কর্মতৎপরতার এটাই হলো প্রারম্ভিক বিন্দু। দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশী সময় ধরে চলা তথাকথিত উদারনীতি-শিল্পনীতি-কৃষিনীতি একদিকে দেশের শ্রমজীবী জনগণকে তীব্র সংকটে ফেলে দিচ্ছে আর অন্যদিকে মুনাফা-হাঙর, জমি-হাঙর একদল চরম দুর্নীতিগ্রস্ত কর্পোরেট পুঁজিপতির বিত্তকে পাহাড়-প্রমাণ করে তুলছে। ভারত দ্বিখণ্ডিত হচ্ছে 'দারিদ্র্য-পীড়িত, অবহেলিত, ক্ষুধার্ত ভারতে' আর 'সাইনিং ইণ্ডিয়ায়'। সেই কর্পোরেট দুনিয়াই দারিদ্র্য ও ক্ষুধার্ত ভারতকে বলে চলেছে 'জবরদস্ত এক শাসকের' প্রয়োজনের কথা। এই উদারনীতি-শিল্পনীতি-কৃষিনীতি-সমাজনীতির পাঁকের মধ্যে যে 'পদ্মফুল' গজাচ্ছে, তাকে উপড়ে ফেলতে হলে ঐ জনবিরোধী '**উদারনীতির পরিবর্তন**'-এর লড়াই আরও জোরালো করা ছাড়া ভিন্ন পথ নেই। **নীতি বদল করো, শাসন বদল করো, সংসদে জনগণের আওয়াজ ওঠাও**—শ্লোগানের তাৎপর্য এখানেই। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সপ্তম কংগ্রেসে জর্জ ডিমিট্রভ যে সতর্কবার্তা জারি করেছিলেন, আমরা একবার তা স্মরণ করে নিতে পারি—

''ফ্যাসিবাদী একনায়কত্ব কায়েম হওয়ার আগে বুর্জোয়া সরকারগুলো সাধারণভাবে কিছু প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে এবং **অসংখ্য প্রতিক্রিয়াশীল নীতি** গ্রহণ করে, যা সরাসরি ফ্যাসিবাদের ক্ষমতায় আসার পথ সুগম করে'' এবং ''যারা বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল পদক্ষেপগুলো এবং **ফ্যাসিবাদের বৃদ্ধিকে** প্রাথমিকস্তরেই প্রতিরোধ করেন না তাঁরা **ফ্যাসিবাদের বিজয়** ঠেকাতে তো পারেই না বরং **ফ্যাসিবাদের বিজয়কেই** সহায়তা করবেন''। কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ-১ সরকার (সরকারি বাম দলগুলো সমর্থিত) তার তথাকথিত '**ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচী**'তে গুজরাট গণহত্যার তদন্ত কমিশন ও বিচারের কথা (ন্যুরেনবার্গ ট্রায়ালের মত) বলেছিল তার প্রতি বিন্দুমাত্র ইতিবাচক ভূমিকা নেয়নি, উল্টে ইউ পি এ-২ সরকার (যাতে একটা সময় পর্যন্ত শরিক ছিল তৃণমূল কংগ্রেস) আপাদমস্তক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়ে লুঠের রাজত্ব কায়েম করেছিল। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও জীবনদায়ী পণ্য সামগ্রীর নিরন্তর **মূল্যবৃদ্ধি, চরম বেকারত্ব, কর্মচ্যুতি ও মজুরি শোষণের** জ্বালায় দেশের শ্রমজীবী জনগণ যখন বিপর্যস্ত, তখন কর্পোরেট স্বার্থে রচিত হচ্ছে **জমি-লুঠ, প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠের** কালাকানুন। জনগণের যে কোন প্রতিবাদ দমন করা হচ্ছে **দেশদ্রোহ আইন** ও **অন্যান্য কালাকানুনের** সাহায্যে, যার পোষাকি নাম **অপারেশন গ্রীণ হান্ট**। জনগণ এ অপশাসন থেকেও মুক্তি চায়। গণক্ষোভে কেন্দ্রের শাসন ক্ষমতা থেকে এই অপদার্থ, ব্যর্থ, দুর্নীতিগ্রস্ত, দেশবিক্রির খলনায়ক কংগ্রেস ও শরিক দলগুলোর বিদায় তাই সময়ের অপেক্ষা। দেশব্যাপী এই প্রেক্ষাপটে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন।

মমতা ব্যানার্জীর 'ফিল গুড' ও প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার পরিমণ্ডল

২০০৯ থেকে ২০১৪ গঙ্গা-যমুনা ও দামোদর দিয়ে বহু জল বয়ে গেছে। ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচন এ রাজ্যে জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত থেকে আলগা হয়ে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের ভুল জমি-নীতি, উন্নয়ন-নীতির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা তীব্র গণক্ষোভের আবর্তে। বামফ্রন্ট সরকার হয়ে পড়েছিল 'লেম-ডাক' সরকার। ঐ সরকারের বিরুদ্ধেই লোকসভা নির্বাচনে জনমত চলে গিয়েছিল মমতা ব্যানার্জী নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস-কংগ্রেস জোটের দিকে। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে, মমতা ব্যানার্জীর তথাকথিত ১৬-১৭ জোটের আর কোন নামগন্ধ নেই। ইতিমধ্যে রাজ্যের ক্ষমতায় থাকার মেয়াদও আড়াই বছর কেটে গেছে। প্রতিশ্রুতির বন্যা আর 'ফিল-গুড' আবহাওয়া ছাড়া মমতা-সরকার এ রাজ্যের জনজীবনের কোন বুনিয়াদী ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করতে তো পারেইনি, এমনকি সমস্যাগুলো সমাধানে প্রাথমিক কোন পদক্ষেপও নেয়নি। 'সততার প্রতিমূর্তি' এখন সারদা কেলেঙ্কারি, গোদালা কেলেঙ্কারি, টেট এবং এস এস সি দুর্নীতিতে কলঙ্কিত। কোন আন্না হাজারে এই দুর্নীতি ও কলঙ্কের দাগ মুছতে পারবে না। 'পাহাড় হাসছে', 'বাংলাকে খণ্ড হতে দেব না', 'আমি রাফ এ্যাণ্ড টাফ' ইত্যাদি আওয়াজের পেছনে রয়েছে বাংলায় **উগ্র জাত্যাভিমান** গড়ে তোলার ঘৃণ্য চক্রান্ত। মমতা ব্যানার্জীর পক্ষে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা সম্ভব নয় (যেমন করেছিল ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সালে), তাই '৭১-এর বাঙালী জাত্যাভিমান আর ও পথে গড়ে তোলা সম্ভব নয় বলে মমতা ব্যানার্জী ও তাঁর দলবল অখণ্ড বাংলা আর **কেন্দ্রে সরকার গঠনের নিয়ন্ত্রক** হওয়ার শ্লোগান তুলছে। নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের স্বাভিমান ও উন্নয়নের গল্প শোনাচ্ছে, মমতা ব্যানার্জীও 'বাংলার স্বাভিমান ও উন্নয়নের ফিরিস্তি' দিচ্ছেন।

অথচ বাস্তব কি বলে? গ্রাম বাংলার কর্মহীন মানুষ যখন দেশান্তরী হওয়ার মিছিলে সামিল, তখনও গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্পে ১০০ শতাংশ সাফল্যের আড়ালে রয়েছে **নির্মম মজুরি চুরি**। ২৪/২৫ বা ৬০/৭০ দিন কাজ যাই হোক না কেন, মাসের পর মাস পুরো মজুরি মিলছে না—বড়জোর ৭/১০ দিন। নরেন্দ্র মোদীর পৃষ্ঠপোষক মুকেশ আম্বানী, এরাজ্যে তার 'রিটেল চেইন' ব্যবসা চালাতে পি পি পি মডেলে **কিষাণ মাণ্ডি** গড়ে তোলার গল্প শোনাচ্ছে। ন্যায্য মূল্যে কৃষক উৎপাদকদের কাছ থেকে ফসল ক্রয়ের ব্যবস্থা নেই, খরিফ শস্য বিক্রি করতে না পারায় বোরো চাষ ২০-২৫ শতাংশ কমে গেল, কৃষকের আত্মহত্যার কথা এই মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করতে রাজী নয়, শুধু কিষাণ কার্ড বিলির পাতা-জোড়া বিজ্ঞাপন, কিন্তু দরিদ্র, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীরা ব্যাঙ্ক বা সমবায় থেকে ঋণ পায় না—মহাজনী ফাঁসে আত্মহত্যাই পথ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জঙ্গলমহলে শ্মশানের শান্তি প্রতিষ্ঠায় যৌথ বাহিনীর ভারী বুট এখনও সশব্দে ঘুরে বেড়ায় আর 'অক্সিজেনের অভাবে' নয়া গেস্টাপো বাহিনী **ধর্ষণ করে চলে বাংলার গণতন্ত্রকে**। নারীর ওপর হিংসা, বর্বরতা ও ধর্ষণের রেকর্ড সৃষ্টির পর গণতন্ত্র নিধনের যজ্ঞ শুরু হয়েছে। একটা বন্ধ কারখানা খোলেনি, একটাও রুগ্ন কারখানার পুনরুজ্জীবন হয় না—অথচ রাজ্যের রাজস্ব আয় নাকি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে—এই চমকের জন্য **ফিকি**-র গোমস্তা অর্থমন্ত্রীর পদের সঙ্গে শিল্প দপ্তরের বাড়তি পদও পেয়ে যান। যে রেনিগেড শ্রমমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন তার শ্রমিকদের নিয়ে ভাবার কোন সময় নেই—শ্রমিক-কর্মচারীর সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের টাকা যারা লুঠ করেছে, তাদের সুরক্ষা নিয়েই শ্রমমন্ত্রী ব্যস্ত। মথুয়া-মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে (প্রণামী হিসাবে, বড় ছেলে সাংসদের দৌড়ে, ছোট ছেলে মন্ত্রী) দলিত ও সংখ্যালঘুদের প্রতি বেইমানির ইতিহাস রচনা করছেন 'ভাবী প্রধানমন্ত্রীর কিং-মেকার'। সাচার কমিটির সুপারিশগুলোর কি হলো, রঙ্গরাজন কমিটির সুপারিশগুলো কতটা কার্যকরি হল তার কোন তথ্য-সম্বলিত রিপোর্ট আপনি কোথাও খুঁজে পাবেন না। এ রাজ্যে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে 'পেসা' কেন লাগু হল না, সে প্রশ্নও বৃথা।

গণক্ষোভ তাই ধূমায়িত হতে বাধ্য। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা গড়ে উঠবেই। কিন্তু ২০০৯ সালে যারা ক্ষমতায় ছিল এখন বিরোধীপক্ষ, তারা ঘর সামাল দিতেই ব্যস্ত। সযত্ন-লালিত বুদ্ধিজীবীরা হাওয়া-মোরগের মত হাওয়ার দিকেই ঘুরতে শুরু করেছেন, কোন কোন পার্টিকর্মী লালঝাণ্ডা হাতে নিয়ে তৃণমূল ভবনের ডাকাত-সর্দারের কাছে লালঝাণ্ডা বিসর্জন দিচ্ছে। এটা প্রতীকী মাত্র, সব প্রতীকীর লাইভ টেলিকাস্ট হয় না, সব আত্মসমর্পণ প্রকাশ্যে হয় না। শুধু কৌশল করে বামপন্থাকে বাঁচানো যায় না। 'তৃতীয় বিকল্পের' রথের চাকা কাদায় আটকে গেছে, 'বন্ধুরা' একে একে আলবিদা জানাচ্ছে। অথচ নেতৃত্বের সম্বিত ফেরে না—লাখো বামপন্থী কর্মীর রক্ত-ঘামে গড়ে ওঠা একটা পার্টির নেতৃত্ব কবে মরীচিকার পেছনে ছোটা বন্ধ করবে আল্লা-ই তা বলতে পারেন।

এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবী বামপন্থী শক্তিকে সমস্ত ক্ষমতা উজাড় করে লড়াই-এ নামতে হবে। কোন অলসতাকে ইতিহাস ক্ষমা করবে না। এটা ঠিকই, রাজ্যজুড়ে বিপ্লবী বামশক্তি এখনও তার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কোন কোন কাজের এলাকাগুলোতে গণভিত এখনও মজবুত ও শক্তিশালী নয়। তাই নির্বাচনী লড়াইয়ে মাত্র ৫টি কেন্দ্রেই আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। আমরা কি আশা করতে পারি না আমাদের সমস্ত কমরেড যদি তাদের মেধা-প্রজ্ঞা-কর্মতৎপরতা দিয়ে এই লড়াইয়ে সামিল হন, তাহলে লড়াই জোরদার করা সম্ভব। নিশ্চিত সম্ভব। আগামীদিনে বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠনের স্বার্থে তা জরুরীও বটে। আসুন, এই লড়াইয়ে আমরা নিজেদের পূর্ণ উদ্যমে নিয়োজিত করি। প্রতারক সরকার ও দলগুলোকে উচিত শিক্ষা দিতে জনগণকে সামিল করি।

- পার্থ ঘোষ

টেট ছাত্রদের উপর পুলিশী আক্রমণ প্রতিবাদে মুখর আইসা

আবার গণআন্দোলনের উপর পুলিশী আক্রমণ, এবার আক্রান্ত প্রায় হাজার খানেক টেট দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রী। রাজ্যজুড়ে টেট কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে মরণপণ আন্দোলনে নেমেছে হাজার হাজার টেট ছাত্রছাত্রী। ১৮ মার্চ এ পি সি ভবনের সামনে আমরণ অবস্থানের জন্য বিধাননগরের ময়ুখ ভবনের সামনে জমায়েত হয়েছিল ছাত্রছাত্রীরা। জমায়েত হওয়ার সাথে সাথেই তাদের জমায়েতকে লাঠি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয় পুলিশ। তারপর বিক্ষিপ্ত ছাত্রছাত্রীদের সারা বিধাননগর জুড়ে তাড়া করে বেড়ায় পুলিশ, র‍্যাফ ও কমব্যাট বাহিনী। পুলিশ ছয়জন আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তারও করে। গ্রেপ্তার হওয়া ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন আন্দোলনকারীদের প্রধান মুখপাত্র তুলসী মাসান্তো। পরে অবশ্য পুলিশ ধৃতদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। শিয়ালদহ, হাওড়া স্টেশন ও ধর্মতলা বাস স্ট্যাণ্ডেও প্রচুর ছাত্রছাত্রী জমায়েত হয়েছিলেন বিধাননগর অভিযানের উদ্দেশ্যে। টেট ছাত্রদের এই জমায়েতে উপস্থিত ছিলেন আইসার ছাত্রছাত্রীরাও।

রাজ্য সরকারের এই ন্যক্কারজনক ভূমিকাকে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে আইসা পরদিন কলেজ স্ট্রীটে প্রতিবাদী মিছিল সংগঠিত করে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কুশপুতুল পোড়ানো হয় প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। অবরোধ চলকালীন আইসার কলকাতা জেলা সম্পাদক দেবমাল্য হালদার বক্তব্যে জানান যে ক্ষমতাসীন দলের এই নির্লজ্জ দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতারিত পরীক্ষার্থীদের আন্দোলনের সাথে আইসা সর্বোতভাবে যুক্ত থেকে লড়াই চালিয়ে যাবে।

পি এইচ ই শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মতলায় আইন অমান্য

এ আই সি সি টি ইউ-র অন্তর্ভুক্ত সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ পি এইচ ই কন্ট্রাক্টরস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ১০ মার্চ আইন অমান্য কর্মসূচী পালিত হয়। স্থায়ীকরণ, ন্যূনতম ১০ হাজার টাকা বেতন ও পরিচয়পত্রের দাবিতে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী ধর্মতলায় পৌঁছে আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করেন।

'পরিবর্তনে'র সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী সুব্রত মুখার্জী স্থায়ীকরণের প্রতিশ্রুতি দিলেও আজও প্রায় ১০ হাজার শ্রমিক-কর্মচারী অস্থায়ী বা কন্ট্রাক্ট শ্রমিক হিসাবে দীর্ঘ ১৫/১৬ বছর কাজ করে আসছেন। মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি রাখেননি। এমনকি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিও করা হয়নি। মন্ত্রী-আমলা এবং কন্ট্রাক্টরদের অশুভ আঁতাত স্থায়ীকরণ এবং বেতন বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে আমরা মনে করছি।

আইন অমান্য কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন এ আই সি সি টি ইউ-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাসুদেব বসু, রাজ্য সম্পাদক এবং পশ্চিমবঙ্গ পি এইচ ই কন্ট্রাক্টরস্ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি দিবাকর ভট্টাচার্য, ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক দুলাল বক্সী, কার্যকরী সভাপতি ফাল্গুনী মুখার্জী প্রমুখ। আইন অমান্য কর্মসূচী পালনের সময় নেতৃবৃন্দ আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

তৃণমূল কংগ্রেস ও অপরাধ জগৎ একাকার

অতি সম্প্রতি ৯ মার্চ ২০১৪ কেন্দ্রীয় রাজস্ব বিভাগের গোয়েন্দারা বসিরহাট-বারাসত রাস্তায় একটি দামি গাড়ি আটক করে তার মধ্যে পাওয়া ৪২ কেজি সোনা (বিস্কুট ও বার) বাজেয়াপ্ত করেন, বাজারে যার মূল্য আনুমানিক ১৫ কোটি টাকা। রাজস্ব বিভাগের ঐ অফিসাররা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে বেআইনি পথে ঐ সোনা আসছিল এবং আমদানি শুল্ক ফাঁকি দিয়ে অনেক কম দামে দেশের বাজারে বিক্রি করার জন্যই তা কালো পথে পাচার হচ্ছিল। ঐ সোনা পাচারের জন্য গ্রেপ্তার হন আবদুল বারিক বিশ্বাস নামে বসিরহাটের জনৈক ব্যক্তি ও তার ড্রাইভার।

কে এই আবদুল বারিক বিশ্বাস? সংবাদপত্র সূত্রে জানা যাচ্ছে—লরির খালাসি হিসেবে জীবন শুরু করে সে আজ কোটিপতি। সোনা পাচারের কারবার ছাড়াও সে ১৮টা ইটভাটা ও প্রচুর জমির মালিক, একাধিক বড়-বড় বাড়িও তার রয়েছে বিভিন্ন স্থানে। তার বিরুদ্ধে গরু পাচার, মাদক পাচার এবং এমনকি মেয়ে পাচারের অভিযোগও রয়েছে। আজ সে এক বিশাল পাচার চক্রের নিয়ন্ত্রক। আনন্দবাজার পত্রিকায় বেরিয়েছে, ''বারিকের সাম্রাজ্যে এমন হাজার খানেক ছোট-বড় পাচারকারী রয়েছে বলে দাবি গোয়েন্দাদের''। অপরাধ জগৎ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা-পুলিশ গাঁটছড়ার যে সর্বব্যাপিতা আজ প্রকট বাস্তব, আবদুল বারিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবে কেন? বারিক বসিরহাটের তৃণমূল নেতা বলে প্রকাশ পেয়েছে এবং তার দাদা গোলাম বিশ্বাস বসিরহাটের তৃণমূল নেতা ও জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ। বারিক গ্রেপ্তার হওয়ার পর তৃণমূল নেতৃত্ব যথারীতি তৃণমূলের সঙ্গে তার যোগাযোগকে অস্বীকার করতে উদ্যত হয়েছেন। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার তৃণমূল পর্যবেক্ষক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেছেন—গোলাম বিশ্বাস তাঁদের নেতা ঠিকই, কিন্তু দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত ছিল। বারিক একবার এমনকি তার দাদাকে হত্যার চক্রান্তও করে। কিন্তু সংবাদপত্র তৃণমূলের সঙ্গে বারিকের সম্পর্ককে অস্বীকার করা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মন্তব্য ছাপার সঙ্গে এই বিষয়টাও জানিয়েছে যে, ''তাকে (বারিককে) প্রায়শই দলের সভাগুলোতে দেখা যেত এবং সে দলের স্থানীয় কিছু নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠও ছিল। গত সংসদীয় নির্বাচনে সে ভালো পরিমাণ টাকাও দেয়।'' (টেলিগ্রাফ, ১০ মার্চ ২০১৪)। সংবাদপত্র থেকে আরও জানা গেছে যে, বারিকের দুটো পিস্তল রয়েছে। দ্বিতীয় পিস্তলের লাইসেন্স দেওয়ার সময় পুলিশ কিছু আপত্তি জানালেও সেই আপত্তি কাটিয়ে দ্বিতীয় লাইসেন্সটি পেতে তার অসুবিধা হয়নি। কিন্তু কেমন করে তা হল? ''এটা হতে পেরেছিল কেননা সাংসদ বারবারই জেলা প্রশাসনের উচ্চস্তরের কর্তাব্যক্তিদের কাছে ফোন করে আবদুলের আবেদনে অনুমোদন দেওয়ার কথা বলেন।'' (টেলিগ্রাফ, ১২ মার্চ ২০১৪)। আর ঐ সাংসদ বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ নুরুল ইসলাম বলেও জানা গেছে। ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে ও ইন্টারনেটে ছবি বেরিয়েছে—আবদুল বারিক বিশ্বাস তৃণমূলের পতাকা গলায় ঝুলিয়ে ঐ দলের সভায় বক্তব্য রাখছেন। ঐ ছবির দিকে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি সেটাকে কংগ্রেসের চক্রান্ত বলে অভিহিত করেন—''কংগ্রেস আমাদের দলের পতাকা নিয়ে বারিককে মঞ্চে পাঠিয়েছিল।'' গ্রেপ্তারের পর আবদুল বারিক বিশ্বাসকে আদালতে তোলা হলে বিচারপতি তাকে পুলিশী বা জেল হেফাজতে না দিয়ে জামিন দিয়ে দেন। এই অনায়াসে জামিন পাওয়ার জন্য বিচারপতি গ্রেপ্তারিতে কিছু পদ্ধতিগত ত্রুটির উল্লেখ করেন। রাজস্ব বিভাগের যে গোয়েন্দারা তাকে গ্রেপ্তার করেন, তাঁরা গ্রেপ্তারি মেমোয় প্রত্যক্ষদর্শীর নাম ও স্বাক্ষর রাখেননি এবং আদালতের কাছে যে কাগজপত্র জমা দেন তার সঙ্গে সিজার লিস্ট ছিল না। পদ্ধতিগত এই ত্রুটির জন্যই সোনা পাচারকারী জামিনযোগ্য বলে বিচারপতি মনে করেছেন। যে গোয়েন্দারা এই ধরণের অবৈধ মাল বাজেয়াপ্ত ও পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করতে সিদ্ধহস্ত, যে কাজ তাঁরা দিনের পর দিন করে চলেছেন, তাঁদের এই ধরণের ভুল বিস্মিত করে ও কিছু প্রশ্নের জন্ম না দিয়ে পারে না। আবদুল বারিক বিশ্বাসকে মুক্ত করতে তার রাজনৈতিক সংযোগের লম্বা হাত কি রাজস্ব গোয়েন্দা দপ্তরের উচ্চস্তরের কর্তাব্যক্তি ও আদালত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল? তাকে আটক রাখতে না পেরে গোয়েন্দারা কি জেরার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া থেকে (পাচার সংক্রান্ত এবং রাজনৈতিক যোগাযোগের তথ্য) বঞ্চিত হলেন না? তার অপরাধের জন্য আবদুল বারিক বিশ্বাস কি যথাযোগ্য শাস্তি পাবে?

সাম্প্রতিককালে সোনা পাচারের বাড়বাড়ন্তর জন্য সরকারের শুল্ক নীতিই দায়ী বলে বলা হচ্ছে। আগে যেখানে বৈধ পথে এক কেজি সোনা আমদানি করতে ২২০০০ টাকা আমদানি শুল্ক লাগত, শুল্কের হার বৃদ্ধির পর সেই পরিমাণ বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে তিন লক্ষ টাকায়। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে কালো পথে সোনা আমদানি করতে পারলে এখন কম করে ৩ লক্ষ টাকা লাভ করা যায়। সোনা পাচারের পিছনে শুল্ক নীতির যে ভূমিকাই থাক, এটাও প্রশ্নহীন বাস্তব যে, রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্রয় ও মদত ছাড়া পাচারের এই রমরমা হতে পারে না। তৃণমূল কংগ্রেসে যে অপরাধ জগতের লোকজনদের ও সমাজবিরোধীদের ভিড় তা এই সরকারের আড়াই বছরেরও বেশি সময়ের শাসনকালে বারবারই সামনে এসেছে। এই দল যে কোন সুস্থ সংস্কৃতির তোয়াক্কা করে না, ধারাবাহিকভাবেই তারা যে এক অসামাজিক সংস্কৃতির চর্চা করে ও তাকে পুষ্ট করে চলেছে—নির্বাচন, শিক্ষা থেকে সমস্ত ক্ষেত্রেই তা প্রতীয়মান হয়েছে। তৃণমূলের আশ্রয় ও মদতেই যে বারিক বিশ্বাসের অবাধ কারবার ও অপরাধ সাম্রাজ্যের বিস্তার, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকদের হাজারো অস্বীকৃতি সত্ত্বেও তাকে চেপে রাখা যাচ্ছে না। এরকম অনেক বারিকই ঐ দলের আশ্রয়ে রয়েছে এবং অনায়াসে তাদের কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। এরা তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচারে টাকা ঢালে, তাদের হয়ে ভোট জোগাড় করে, আবার গণআন্দোলন মাথাচাড়া দিলে তাকে দমন করতে এগিয়ে আসে। সোনা পাচার থেকে কালো পথে অর্জিত টাকার কিছু অংশ যে আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূলের প্রচার অভিযানে যেত তা সহজেই অনুমেয়। অবশ্য, অন্যান্য বড় বড় দলও এই সংস্কৃতির বাইরে নয়। তৃণমূলের অসামাজিক কার্যকলাপ, তার কিছু নেতৃবৃন্দের দুর্বৃত্তসুলভ আচরণ সত্ত্বেও কিছু কিছু ভাষ্যকার মমতা ব্যানার্জীর সততার ঢাক পেটাতে একটুও সংকুচিত হন না। এখানে সারদা কেলেঙ্কারির উন্মোচন এবং তাতে তৃণমূল নেতৃত্বের অনেকেরই জড়িত থাকা প্রকাশ হওয়ার পরও (দলের একজন সাংসদ তো এখনও জেলে রয়েছেন) মমতাময় প্রচারকরা তাঁর সততার বিজ্ঞাপনে অকুণ্ঠ। তবে বিজ্ঞাপন বাস্তবকে বেশিদিন আড়াল করতে পারে না। আগামী দিনগুলোতে তৃণমূল কংগ্রেস ও অপরাধ জগতের সংযোগ অবশ্যম্ভাবিভাবেই আরও বেশি করে উদঘাটিত হবে এবং তৃণমূলের প্রকৃত চরিত্র জনগণের কাছে ক্রমেই আরও প্রকট হয়ে উঠবে। তার এই উন্মোচন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে আমাদের যেমন সক্রিয় হতে হবে, তেমনি অপরাধ জগতকে সঙ্গে নিয়ে তার রাজনৈতিক হামলার প্রতিরোধের জন্যও প্রস্তুতি নিতে হবে।

- জয়দীপ মিত্র

লোকসভা নির্বাচনে ... সি পি আই (এম এল) লিবারেশন

একের পাতার পর

বিক্ষোভ আন্দোলন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় কমিটি।

আমাদের রাজ্যে ৫টি লোকসভা কেন্দ্রেই কেন্দ্রভিত্তিক জনসভা ও গণসম্পর্ক অভিযানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পার্টির সমস্ত শক্তি (পার্টি সংগঠন ও গণসংগঠনগুলোর মিলিত শক্তি)-কে এই সমস্ত উদ্যোগে সামিল করানোর প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। গণসম্পর্ক অভিযানকে আরও নিবিড় ও ব্যাপক করা এবং ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার ওপর আমাদের জোর দিতে হবে। ওপরে ওপরে ও ভাসাভাসা প্রচারের পরিবর্তে বুথভিত্তিক গ্রাম-বৈঠক, গ্রামসভা ও গণপ্রচারে আমাদের জোর দিতে হবে। একাজ তখনই ভালভাবে করা সম্ভব যখন আমরা পার্টি ব্রাঞ্চ ও গণসংগঠনগুলোকে একাজে পূর্ণ উদ্যোগে সামিল করাতে পারব। পার্টির জেলা কমিটি ও গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দকে এদিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

৫। কেন্দ্রীয় নির্বাচনী ইস্তাহারের পরিবর্তে এবারের নির্বাচনে আমরা **জাতীয় দাবিসনদ** (ন্যাশনাল চার্টার) ও **রাজ্য দাবিসনদ**—জনগণের বুনিয়াদী ও গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলোর ভিত্তিতে—জনগণের কাছে নিয়ে যাব। গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কেন্দ্রগুলোতে ২/১টি দাবিকেও এই সঙ্গে আমরা তুলে ধরবো। এই দাবিসনদের পাশাপাশি রাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে ''**আমাদের আবেদন**'' প্রকাশ করব। কেন্দ্রভিত্তিক/জেলাভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলোর ভিত্তিতে আমাদের প্রচারপত্র প্রকাশ ও অন্যান্য প্রচারের রূপগুলোকে গ্রহণ করতে হবে।

৬। রাজ্য দাবিসনদের বিষয়বস্তু

- **২০০ দিন কাজ, ৩০০ টাকা মজুরি ও ৭ দিনের মধ্যে মজুরি চাই।**
- **৩ একর পর্যন্ত কৃষিকাজে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দাও।**
- **গৃহস্থের বিদ্যুতের মূল্য ৫০ শতাংশ কমাতে হবে।**
- **সন্ত্রাস-দুর্নীতি-দলতন্ত্র মুক্ত বাংলা গড়তে সি পি আই (এম এল) লিবারেশন প্রার্থীদের ''পতাকায় তিন তারা''য় ভোট দিন।**
- **কৃষকের আত্মহত্যা রোধ কর, মহাজনী প্রথা বন্ধ কর—ক্ষুদ্র গরিব কৃষকদের বিনা শর্তে, বিনা সুদে ঋণ দাও।**
- **মহিলাদের ওপর হিংসা, নির্যাতন ও শ্লীলতাহানির মদতদাতাদের একটি ভোটও নয়।**
- **১০ হাজার টাকা ন্যূনতম মজুরি, কাজের নিরাপত্তা ও মর্যাদা চাই—সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলোকে সম্মানজনক ও জীবনধারণের উপযোগী করতে হবে।**
- **লাভজনক দরে সরকারকে কৃষকদের কাছ থেকে ফসল ক্রয় করতে হবে—সংরক্ষণের জন্য বহুমুখী হিমঘর চাই।**
- **সিঙ্গুরের কৃষক জমি পেল না, নন্দীগ্রামের কৃষক বিচার পেল না কেন—তৃণমূল কংগ্রেস জবাব দাও।**
- **যৌথ বাহিনী ও কালা-কানুন প্রত্যাহার করো—সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই।**
- **সারদা-টেট ও পঞ্চায়েতী দুর্নীতিতে লিপ্ত তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট নাই।**

৭। কেন্দ্রীয় শ্লোগান—

- **নীতি বদলাও-সরকার বদলাও, সংসদে ওঠাও জনতার আওয়াজ।**
- **জমি-কৃষি-কৃষক বাঁচাও, কর্পোরেট লুঠের রাজ হঠাও।**
- **সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলাদের মর্যাদা-সমতা-নিরাপত্তা চাই।**
- **দাঙ্গা, গণহত্যা ও ধর্ষণের অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি চাই।**
- **দলিত-গরিব-সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য মর্যাদা, সুরক্ষা ও দ্রুত উন্নতি চাই।**
- **দাম বাঁধো-কাজ দাও, কাজের পুরো মজুরি দাও।**

৮। পার্টির প্রার্থীরা যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সেখানেই আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। তাকে আরও কিভাবে উন্নত করা যায় তাতে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে। যেখানে আমরা প্রার্থী দিচ্ছি না, সেখানে আমাদের সমর্থক-দরদীরা সরাসরি অন্য কোন দল/সংগঠনের নির্বাচনী কাজে অংশ নেবেন না। আমরা এ রাজ্যে বিজেপি-কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট না দেওয়ার আবেদন জানাব এবং যেখানে আমাদের প্রার্থী নেই, সেখানে সাধারণভাবে সংগ্রামী বাম-গণতান্ত্রিক প্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেওয়ার কথা বলব।

তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে রক্তাক্ত পরিণতি

শাসন ক্ষমতায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের দিন যত যাচ্ছে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে দলের অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক সংঘাত। সংবাদপত্রে প্রায় প্রতিদিনই ঐ দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের খবর প্রকাশ হয়ে চলেছে এবং সম্প্রতি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব থেকে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘাতের সংবাদ এসেছে বর্ধমানের মন্তেশ্বর থেকে। ১০০ দিনের কাজ, কাজে দুর্নীতি, কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব এবং বিশেষ গোষ্ঠীর লোকজনদের কাজ দেওয়া—এসব নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল হাবিব সেখ ও লাল্টু সেখ—এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। সেই দ্বন্দ্ব আর ক্ষোভ-বিক্ষোভের মধ্যে আটকে না থেকে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের চেহারা নিল। গত ৭ মার্চ ২০১৪ যখন একটি বৈঠক চলছিল তখন হাবিব গোষ্ঠীর লোকজন অপর গোষ্ঠীর লোকজনদের ওপর বোম-বন্দুক নিয়ে চড়াও হয়। ঐ আক্রমণে সুখচাঁদ মণ্ডল ও ইমাদ মল্লিক নামে দুই ব্যক্তি নিহত হন। আরও দুই ব্যক্তি গুরুতর আহত অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে বলে জানা গেছে। জেলা তৃণমূল নেতৃবৃন্দ এই সংঘাতের উৎস পারিবারিক বিবাদের মধ্যে রয়েছে বলে দাবি করলেও তা যে বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বেরই পরিণতি তাকে চেপে রাখা যাচ্ছে না। তৃণমূল কংগ্রেস যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক তার অনিবার্য পরিণতি যে এই ধরণের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও সংঘাত তা দিনের পর দিন ক্রমেই আরও প্রকট হয়ে চলেছে। সংঘাত শুধু বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যেই হচ্ছে না, বিভিন্ন মন্ত্রীর মধ্যেও হচ্ছে এবং মমতা ব্যানার্জী গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সহ্য করবেন না বলে হুমকি দিলেও তা কিন্তু প্রকাশ হয়েই চলেছে। যে গুণ্ডারা দলের অপর গোষ্ঠীর লোকদের অবাধে খুন-খারাপি করতে পারে, রাজনৈতিক বিরোধীপক্ষ ও গণআন্দোলনের শক্তিগুলোই যে তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হবে তা বলাই বাহুল্য।

''আজকের দেশব্রতী'' সম্পাদকমণ্ডলী

অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল,
অতনু চক্রবর্তী, জয়দীপ মিত্র,
অমিত দাশগুপ্ত, সৌভিক ঘোষাল ও
কল্যাণ গোস্বামী

তৃণমূলের ব্রিগেডসভা-বাজেট ভাষণ-শিলান্যাসের সিরিয়াল! গ্রামের গরিবদের মজুরি নিয়ে নীরব! কাজের নামে ধাপ্পা!!

ব্রিগেডে লক্ষ লক্ষ মানুষের সভা, বাজেটে লম্বাচওড়া প্রতিশ্রুতি, শিলান্যাসের সিরিয়াল চলছে। কিন্তু তৃণমূলের প্রায় তিন বছরের শাসনে গ্রামের গরিবদের এক টাকাও মজুরি বাড়লো না কেন, ১০০ দিনের প্রকল্পে মজুরীর কোটি কোটি টাকা বকেয়া কেন? তা নিয়ে কোন কথাই শোনা গেল না। কর্মসংস্থানের বড় বড় ফিরিস্তি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু গ্রামে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়ছে কেন তার কোন সদুত্তর নেই। বিগত কয়েক মাসে গ্রাম বাংলার ১১ লক্ষ গরিব মানুষ কাজের আবেদন করেও কাজ পায়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের তৈরী করা এক রিপোর্টের সূত্রে এ কথা জানা গেছে। ১০০ দিনের আইন অনুযায়ী কাজ দিতে না পারলে ভাতা পাওয়া আবেদনকারী কৃষিমজুরদের ন্যায্য অধিকার। ১৫২ টাকা দৈনিক মজুরির এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ দৈনিক ৩৮ টাকা হারে ন্যূনতম ৬ দিন কাজের বকেয়া ভাতার পরিমাণ দাঁড়ায় ৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা (১০০ দিনের আইন অনুযায়ী সপ্তাহে একটানা ৬ দিন কাজ দেওয়া বাধ্যতামূলক)। কেন্দ্র ১০০ দিন প্রকল্পর মজুরির টাকা বরাদ্দ করে কিন্তু ভাতা প্রদানের আর্থিক দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। ক্ষেতমজুরদের পাওনা ঐ ভাতার টাকা দিতে রাজ্য সরকার অস্বীকার করছে! বাঁকুড়া জেলার হীড়বাঁধ ব্লক, মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি ব্লক সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কৃষিমজুরদের ভাতার আবেদন মাসের পর মাস ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে আছে। বাঁকুড়ায় কৃষিমজুররা পঞ্চায়েত প্রধানকে লিখিতভাবে ভাতার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য করে। ব্যাস! ঐ পর্যন্তই। ব্লক স্তরে ভাতা প্রদানের বিষয়টা বিবেচনাই করা হল না। তৃণমূল সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে 'ধূলো-মাটি উৎসবে'র নামে মোচ্ছব করে চলেছে অথচ কৃষি মজুরদের ভাতা পাওয়ার আইনি অধিকার ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের বহু জায়গায় কাজের আবেদন জমাই নেওয়া হচ্ছে না, ভয় দেখিয়ে তা ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ ১০০ দিনের আইন অনুযায়ী আবেদনের ১৫ দিনের মধ্যে কাজ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

এদিকে পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে যে, রাজ্যের ৩ হাজার ৩৫৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫৫ শতাংশ পঞ্চায়েতে জবকার্ডধারী কৃষিমজুরদের কারুরই ১০০ দিনের কাজ জোটেনি। উল্টে কাজের সামগ্রিক পরিমাণ কমছে।

সাল	গড় কাজের দিন
২০১১-১২	২৬
২০১২-১৩	৩৩
২০১৩-১৪ (জানুয়ারি)	২১

বর্তমানে আরেকটি ভয়াবহ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে কাজ করার পর মজুরি পেতে দীর্ঘ সময় লেগে যাচ্ছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ মজুরেরা কাজ করার পর মাসের পর মাস মজুরী পায়নি। রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর জানাচ্ছে বিগত কয়েকমাসে বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ৮০০ কোটি টাকা! এ রাজ্যে ২০১২-১৩ আর্থিক বছরে ২৭ লক্ষ শ্রমিক ১০০ দিনের কাজ করেও মজুরি পায়নি। কাজ করে দীর্ঘদিন মজুরি না পেয়ে মহারাষ্ট্রে কৃষিমজুররা আত্মহত্যা করেছে বলে একটি খবর সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মজুরি না পাওয়ার ঘটনা তদন্ত করে নির্দিষ্ট তথ্য পেশ করে রাজ্য সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ পাঠায়। কিন্তু এ নিয়ে তৃণমূল সরকারের মন্ত্রীদের কোন হেলদোল নেই।

১০০ দিনের প্রকল্পে ২০১৩-১৪ সালের জন্য রাজ্য সরকারের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২২ কোটি ৬১ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হবে। গত বছর ২০১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত কাজ হয় ৫ কোটি ৮৫ লক্ষ অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার ২৫ শতাংশ মাত্র! গড়ে কাজ হয় ১৮ দিন। এরপর বর্তমান বছরের বিগত ২ মাসে শ্রম দিবসের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭ কোটি ৮ লক্ষ। গড়ে কাজ হয় ২১ দিন! অথচ ঐ সময়কালে জাতীয় গড় ছিল ৩৩ দিন। দেশের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দাঁড়ায় ২৫ নম্বরে।

নিজেদের এই ব্যর্থতাকে আড়াল করতে রাজ্যের তৃণমূল সরকার কেন্দ্রকে দোষারোপ করছে। বাস্তবে ১০০ দিনের কাজে কেন্দ্রীয় শর্তাবলী পূরণ করতে রাজ্য সরকার শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আসলে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থাকে খর্ব করে দিয়ে আমলাদের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতা সৃষ্টি করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী বছরের শুরুতে পঞ্চায়েতকে গণমুখী করে তুলে গ্রাম সংসদ তথা গ্রামের সমস্ত ভোটারদের সাধারণসভার মাধ্যমে বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী করার কথা। কিন্তু এই কাজ গ্রামাঞ্চলে প্রায় বন্ধই করে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি চমক দেখানোর জন্য রাজ্যের সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতে একইদিনে রাস্তা তৈরীর কাজ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে মাটি কাটার কাজ তুলনায় কম হয়েছে। এর ফলে উপকরণ ও মজুরি বাবদ খরচের নির্ধারিত অনুপাত (৪০ঃ৬০) রক্ষা করা যায়নি। রাস্তার কাজে উপকরণ ব্যয় অনেক বেশী, ফলে ঠিকাদার পার্টি মাতব্বরদের দুর্নীতি ব্যাপক মাত্রায় ঘটেছে। বিভিন্ন জেলায় মহিলাদের অংশগ্রহণের হার কমে গেছে। এর পেছনে অন্যতম একটা কারণ হল, গ্রামের পুরুষ মজুররা কাজের সন্ধানে দূরদূরান্তে চলে যাওয়ায় মহিলারা যারা প্রধানত মাটি বহনের কাজ করে থাকেন তাদের অংশগ্রহণ কমে গেছে। এইসব কারণে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারকে ১০০ দিনের প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ আটকে দেওয়ার অজুহাত দেখানোর সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ১০০ দিনের কাজে সাফল্যের সাতকাহন গাইতে চরম মিথ্যাচার করছে তৃণমূল সরকার। 'জল ধরো জল ভরো' প্রকল্পে যে জলাশয়গুলোকে খনন করার 'সাফল্য' ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হচ্ছে সেগুলো সবই পুরাতন প্রকল্প। ১০০ দিন প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ নিয়ে চূড়ান্ত আর্থিক অনিয়ম অর্থাৎ দুর্নীতি করা হয়েছে। কেন্দ্র বলছে এ বছরে সমস্ত কাজের টাকা দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বলছে, এ বছরের টাকায় বিগত বছরের বকেয়া মেটানো হয়েছে। তাহলে সেটা আগে বলা হয়নি কেন? শোনা যাচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর, মেলা-উৎসবে ১০০ দিনের টাকা খরচ করা হয়েছে!

বিগত 'বাম' জমানায় শোনা যেত কাজের নাকি চাহিদা নেই! কাজ চাইলে দূর দূরান্তে কাজ দেওয়া হতো। দুর্নীতির প্রতিবাদ করলে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হোত। যৎসামান্য কাজ দেওয়া হলেও মাসের পর মাস মজুরি বকেয়া ফেলে রাখা হোত। পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করত পঞ্চায়েত-পার্টি মাতব্বরদের চক্র। এসবের ফলে ১০০ দিনের কাজ সম্পর্কে সৃষ্টি করা হোত অনীহা! এটাকেই চাহিদা নেই বলে প্রতিপন্ন করা হোত। মজুরের যোগান বেশী-চাহিদা কম; ফলে সস্তা শ্রমের বাজার সম্প্রসারিত হয়ে থাকত। এখন তৃণমূলের রাজত্বে বলা হচ্ছে বিরোধী দলের সাথে থাকলে কাজ দেওয়া হবে না। এভাবে ১০০ দিনের কাজে নতুন করে দলবাজীর এক প্রবণতা শুরু হয়েছে। ফিরে আসছে গ্রামীণ আমলা-জমিদারতন্ত্র। ওদিকে চালু কাজগুলোতে মজুরের সংখ্যা বাড়িয়ে দেখাতে একই পরিবারের বহু সংখ্যককে যুক্ত করা হচ্ছে কাগজে-কলমে! ফলে অর্থের নয়-ছয় আরও বহুগুণ বেড়ে গেছে। শাসকদলের অনুগত বানিয়ে বহু সংখ্যক মানুষকে দুর্নীতির জালে জড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে। ৭০ দশকে কংগ্রেসী জমানায় জমিদাররা কাজ করিয়ে দীর্ঘ দিন মজুরীর টাকা ফেলে রাখত। বর্তমানে সরকারী কাজেও সেই জমিদারতন্ত্র নতুনভাবে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। - **জয়তু দেশমুখ**

নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলের শ্রমিকরা নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের পথে

নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলের শ্রমিকরা নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে গত ১৪ মার্চ শ্রমিক সুরক্ষা মঞ্চ গড়ে তোলেন এবং মঞ্চের আহ্বানে চড়িয়াল জয়চণ্ডীপুর অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি শ্রমিক কনভেনশনের আয়োজন করে।

বজবজে অবস্থিত নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলটিতে সরকারের ৪২ শতাংশ এবং শ্রমিকদের ৫২ শতাংশ শেয়ার থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকদের অধিকার কোন দিনই ছিল না। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও কো-প্রমোটার এসেছে আর কিছুদিন থাকার পর কারখানার সম্পত্তি লুঠ করে নিয়ে গেছে। শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য পাওনা চাইতে গেলেই লোকসানের কথা বলা বা দমন-পীড়ন নামিয়েছে।

শ্রমিক কনভেনশনের সভাপতি মঞ্চের আহ্বায়ক বিপ্লব দেবনাথ প্রথমেই প্রস্তাবনা পাঠ করেন। প্রস্তাবনার মূল কথা হচ্ছে ১৯৯৪/১৯৯৫ সাল থেকে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা তাদের গ্রাচ্যুইটি পাননি। ২০০৫ সাল থেকে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা পি এফ-এর পুরো টাকা পাননি। পি এফ, পেনশন খাতে টাকা শ্রমিকদের থেকে কাটা হয় অথচ তা জমা পড়ে না। পি এফ, কো-অপারেটিভ লোন সবই বন্ধ। শ্রমিকরা জুটশিল্প ভিত্তিক মজুরি থেকে অনেক কম মজুরি পায়। পি এফ-এর টাকা না পেয়ে যে সকল অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা কাজে যুক্ত আছেন তাদেরকে ১১০-১১৭ টাকা দৈনিক মজুরি দেওয়া হয়, অথচ বাইরে থেকে শ্রমিক এনে ২৮০ টাকা দৈনিক মজুরি দেওয়া হচ্ছে। গত ৩ বছর যাবত প্রমোশন বন্ধ। তার ওপর শ্রমিকদের উপর চলছে ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন রকমের জুলুম। যখন তখন শ্রমিকদের তুচ্ছ কারণ দর্শিয়ে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শেয়ারের টাকা ছাড়া এক একজন শ্রমিকের লক্ষাধিক টাকা কেটে রাখা হয়েছে। তা সত্ত্বেও শ্রমিকরা কারখানা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। অথচ ম্যানেজমেন্ট শ্রমিকদের সমস্ত ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে যাচ্ছে এবং জুলুম চালাচ্ছে। বর্তমান সরকার সব জেনেও নীরব ভূমিকা পালন করছে। কনভেনশন আহ্বান রাখছে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সমস্ত শ্রমিক এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের সহযোগিতায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে চায়। কারখানার বর্তমান অবস্থাটা তুলে ধরতে এবং ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে শ্রমিক সুরক্ষা মঞ্চর পক্ষে লক্ষ্মী অধিকারি, ব্রীজমোহন, তিলক পাল, সরিফুল, মহিনুদ্দিন বক্তব্য রাখেন।

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সিটুর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক রতন বাগচী, বি সি এম এফের রাজ্য সম্পাদক অতনু চক্রবর্তী, ইউ টি ইউ সি (এল এস)-এর তিমির ঘোষ, সিটুর জেলা সহ-সভাপতি পরশুরাম ঝা এবং এ আই সি সি টি ইউ জেলা সভাপতি কিশোর সরকার বক্তব্য রাখেন। প্রত্যেকেই প্রস্তাবনাকে সমর্থন করেন এবং আগামীদিনে নিউ সেন্ট্রাল জুট মিলের শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন। শেষে শামসুর রহমানের বিখ্যাত কবিতা ''ঘুরে দাঁড়াও'' পাঠ করে সংগ্রামের অঙ্গীকার নিয়ে সভা শেষ হয়। পরের দিন আন্দোলনের নেতা ব্রীজমোহনকে কাজ থেকে বসিয়ে দিলে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিকদের চাপে ম্যানেজমেন্ট কাজে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

জমি বিক্রী, কর্মী সংকোচনের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন

এ আই সি সি টি ইউ, সিটু, এ আই টি ইউ সি, এইচ এম এস অনুমোদিত রাষ্ট্রীয় পরিবহণ শিল্পের (সি টি সি, সি এস টি সি, এস বি এস টি সি, এন বি এস টি সি, ডব্লিউ বি এস টি সি) শ্রমিকদের ইউনিয়নগুলোর গত ৭ মার্চ যৌথ মিছিল শুরু হয় এন্টালী বাজারের সামনে থেকে। কয়েক হাজার শ্রমিক-কর্মচারী রাণী রাসমনি রোডের সমাবেশে সামিল হন। উক্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন এ আই সি সি টি ইউ-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাসুদেব বসু, সিটু-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দীপক দাশগুপ্ত, এ আই টি ইউ সি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রণজিত গুহ।

এ আই সি সি টি ইউ-র দিবাকর ভট্টাচার্য, সিটুর সুধীর বসু, এ আই টি ইউ সি-র রাজদুলাল গোস্বামী, এইচ এম এস-এর রিয়াজ আহমেদ সহ ৮ জনের প্রতিনিধি নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর ও এস ডি শ্রীমতী দেবযানী ওঝার সাথে বৈঠক করেন এবং পরিবহণ শিল্পের জমি বিক্রি বন্ধ করা, কর্মী সংকোচন বন্ধ করা সহ ৮ দফা দাবির ভিত্তিতে সংগৃহীত গণস্বাক্ষরের (প্রায় সাড়ে ৬ হাজার শ্রমিকের স্বাক্ষর) স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে জমা দেওয়া হয়।

সংগ্রহ করুন
আজকের দেশব্রতী
প্রকাশিত
কমরেড সরোজ দত্ত
জন্মশতবর্ষ সংখ্যা

তৃতীয় ফ্রন্ট—সি পি এম, সি পি আই-এর নির্লজ্জ সুবিধেবাদ

শুরুতেই ধাক্কা খেল সি পি এম, সি পি আই-এর তৃতীয় ফ্রন্টের সরকার তৈরীর স্বপ্ন। দেশের অ-কংগ্রেসী অ-বিজেপি দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচনপূর্ব আসন সমঝোতা ও নির্বাচন পরবর্তী বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রে যে জোট সরকার গড়ে তোলার কথা ভেবেছিলেন প্রকাশ কারাট, এ বি বর্ধনরা তা চলতে শুরু করার আগেই আপাতত মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। এমনকী এ বি বর্ধনও বলে ফেলেছেন যে, নির্বাচনের আগে তৃতীয় ফ্রন্টের পরিকল্পনা যথাযথ হয়নি। এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের সংসদে ৩৮টি দল আছে। তার মধ্যে ১১টি অ-কংগ্রেসী, অ-বিজেপি দলের উপরে ভিত্তি করে তৃতীয় ফ্রন্টের সরকার গঠনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার কথা মাসখানেকও হয়নি দিল্লীর বুকে ত্রিপুরা ভবনে সহাস্য মুখে বামফ্রন্টের নেতারা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁদের ভাবনায় ছিল বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতাবান বা ক্ষমতাশালী দলের সঙ্গে আসন বোঝাপড়া করে কিছু আসন বাগিয়ে নেওয়া। এই বোঝাপড়ার সঙ্গে আর যাই হোক বামপন্থা ও বামপন্থী আন্দোলনের কোন যোগ নেই, কোনদিন ছিলও না। ২০০৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ৬০টিরও বেশী আসন পেয়ে বামফ্রন্ট নিজেদের ইউ পি এ-১ সরকারের চালিকাশক্তি হিসেবে গণ্য করত, কিন্তু ২০০৯-এর লোকসভায় ঐ আসনের পরিমাণ অর্ধেক হয়ে যাওয়ায় তাঁদের প্রতিপত্তি বেশ হ্রাস পেয়েছে, একথা তাঁরা মানতে না চাইলেও তাঁদের নিয়ে অন্য আঞ্চলিক দলগুলোর প্রায় রসিকতা তা যারপরনাই বুঝিয়ে দিচ্ছে। যে ১১টি দল নিয়ে উচ্চকিত কণ্ঠে তৃতীয় ফ্রন্টের ঘোষণা হয়েছিল তাঁদের বেশীরভাগই ব্যক্তিকেন্দ্রীক ক্ষমতা প্রত্যাশী দল যারা অতীতে কখনও কংগ্রেস কখনও বিজেপির সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করেছে। সি পি আই, সি পি এম, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক বামফ্রন্টের এই ৪ দলের বাইরে ছিল জয়ললিতার এ আই এ ডি এম কে, নবীন পট্টনায়েকের বিজু জনতা দল (বিজেডি), প্রফুল্ল মহান্তের অসম গণ পরিষদ (অগপ), নীতীশ কুমারের জনতা দল (ইউ) (জেডিইউ), মুলায়ম সিং যাদবের সমাজবাদী পার্টি (সপা), দেবেগৌড়ার জনতা দল (স) (জেডিএস) ও ঝাড়খণ্ড বিকাশ মোর্চা (জেভিএম)। দিল্লীতে সভার পরে বলা হয় যে ঐ ১১টি দল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ এবং বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ-কে পরাস্ত করার লক্ষ্যে একসাথে লোকসভা নির্বাচনে লড়বে। ঐ সভায় অবশ্য অগপ ও বিজেডি অনুপস্থিত ছিল। লক্ষ্যণীয় যে, যারা একসাথে লড়বে বলছে তাঁদের বেশীরভাগেরই কাজের জায়গা এতটাই আলাদা যে কথায় ছাড়া কাজে তাঁদের একসাথে লড়ার অবকাশই নেই। কেবল বামফ্রন্ট অন্তর্ভুক্ত ৪টি দলের লড়াইয়ের জায়গাগুলো কিছুটা অন্য দলগুলোর সঙ্গে ওভারল্যাপ করে। অর্থাৎ ঐ ৪টি দলের, যা প্রকৃত অর্থে সি পি আই এবং সি পি এমের আসন সমঝোতার মধ্য দিয়ে কিছু সুবিধে করে দিতে পারে, কিন্তু এই নির্বাচনমুখী সুবিধেবাদ আখেরে কোন ফল দিতে পারে না আর তা ব্যাকফায়ার করতে শুরু করেছে। যে জয়ললিতার আশ্বাসের উপর ভর করে প্রকাশ কারাটরা তড়িঘড়ি তৃতীয় ফ্রন্টের কথা ঘোষণা করে দেন তিনিই সর্বপ্রথম কারাট-বর্ধনকে দাগা দেন। তাঁদের কেবল একটি করে আসন দিতে রাজি হন যখন দাবিই ছিল ৩টি করে আসনের। সমঝোতার সমাপ্তি ঘটে। সপার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের বিচ্ছেদ ঘটে ঐ আসন না ছাড়ার কারণে, তার জের উত্তরপ্রদেশেও সপার কোন আসন না ছাড়া। কর্ণাটকে ২৮টি আসনেই জে ডি এস লড়বে বলে জানিয়ে দিয়েছে। যেহেতু জে ডি ইউ-র অবস্থা বিহারে খুব ভালো নয়, তাই সেখানে সি পি আই-কে ২টি আসন তারা ছাড়তে রাজী হয়েছে। অন্যদিকে বামফ্রন্টের নিজেদের মধ্যেই আসন নিয়ে দ্বন্দ্ব লেগেছে, যার কারণে কেরলে এল ডি এফ থেকে আর এস পি বেরিয়ে গিয়েছে। সব মিলিয়ে সি পি এম, সি পি আই-এর বহু সাধের তৃতীয় ফ্রন্ট আপাতত বিশ বাঁও জলে। বামপন্থী রাজনীতির দিক থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্য লক্ষ্যণীয়। বিগত দিনগুলোতে কী ইউ পি এ-২-এর দুর্নীতি, কি মূল্যবৃদ্ধি বা সরকারের জনবিরোধী নীতি, কোন কিছুর বিরুদ্ধেই রাস্তায় একসাথে নেমে লড়াই করেনি ঐ ১১ দল। সি পি এম, সি পি আই রোজ বামপন্থাকে শক্তিশালী করার কথা বলছে কিন্তু তা যে কেবল নির্বাচনী সমঝোতার মধ্য দিয়ে হতে পারে না, তার জন্য দরকার রাজপথে গণআন্দোলন সেকথা তারা স্বেচ্ছায় বিস্মৃত হয়েছে। এটি অনস্বীকার্য যে, এই মুহূর্তে কর্পোরেটের মদতপুষ্ট নয়া উদারনীতির অনুগামী দুই প্রধান রাজনৈতিক দল, দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক বিজেপির বিরুদ্ধে সমমনোভাবাপন্ন দলগুলোর একটি তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ে তোলা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু তাকে নীতির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে, কে প্রধানমন্ত্রী হবে তার ভিত্তিতে নয়। আর সেই ফ্রন্টকে অবশ্যই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সমূহের সমস্ত জনবিরোধী নীতি ও কাজের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যেতে হবে। কেবল কয়েকটি আসনে জেতার জন্য নীতিহীন জোট গঠন করে বামপন্থাকে শক্তিশালী করা যায় না। কিন্তু সি পি এম, সি পি আই তেমন কথা ভাবতেই পারছে না।

- অমিত দাশগুপ্ত

শিবদাসপুর ইটভাটা মজুরি চুক্তি সম্পন্ন হল

বেশ কয়েকদফা আলোচনার পর শিবদাসপুর ইটভাটা শ্রমিকদের ২ বছরের (২০১৩ ও ২০১৪) জন্য মজুরি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। তৃণমূল মালিকপক্ষকে মদত ও শ্রমিকদের হুমকি দিয়ে চুক্তি বানচাল করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যায়। শ্রমিকরা এ আই সি সি টি ইউ অনুমোদিত শিবদাসপুর ইটভাটা মজদুর ইউনিয়নের পক্ষে দাঁড়িয়ে যায়। অবশেষে গত ১৪ মার্চ শিবদাসপুর ব্রীক ফিল্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন মজুরি চুক্তি করতে বাধ্য হয়। এবারের চুক্তিতে শ্রমিকদের ২ বছরে ন্যূনতম ১৬০০ টাকা থেকে ১৮০০ টাকা পর্যন্ত মজুরি বৃদ্ধি হবে। শিবদাসপুরে তৃণমূলের সন্ত্রাস উপেক্ষা করে ইটভাটা শ্রমিকদের লড়াই সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের বারাকপুর লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার রাজনৈতিক উদ্যোগ বাড়াতে অবশ্যই সাহায্য করবে।

শিবদাসপুর ব্রীক ফিল্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ১৪ মার্চ ২০১৪ দ্বিপাক্ষিক মজুরি চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ স্বাক্ষরিত হল। চুক্তিগুলো হল—

(১) শিবদাসপুর ইটভাটা মজুদুর ইউনিয়ন ও শিবদাসপুর ব্রীক ফিল্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন শিবদাসপুর অঞ্চলে মোট ১৩টি ভাটার শ্রমিকদের মজুরি সংক্রান্ত দাবি আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেয়। উভয়পক্ষ কয়েক দফা আলোচনা করার পর ১৪ মার্চ শিবদাসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় সহমতের ভিত্তিতে ২০১৩-১৪ ও ২০১৪-১৫ বর্ষের মজুরি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

(২) আগামী দু-বছরের জন্য এই মজুরি চুক্তি কার্যকরি থাকবে। এই চুক্তি অনুযায়ী বোঝাই মিস্ত্রি (হাওয়া), বোঝাই মিস্ত্রি, মাটি ফুলা বিভাগের, ২০১৩ ও ২০১৪ সালের জন্য মজুরি বৃদ্ধির পরিমাণ ১৫ শতাংশ এবং ২০১৪-১৫ সালে ১২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি হবে, আগামী ১৩ মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত এই চুক্তির মেয়াদ থাকবে। চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নতুন মজুরি চুক্তির জন্য আলোচনা শুরু করতে হবে।

(৩) ইটভাটায় নিযুক্ত পাহারাদার (দারোয়ান) এবং ড্রাইভার শ্রমিক ছাড়া অন্যান্য শ্রমিকদের জন্য এই মজুরি বৃদ্ধি কার্যকরি হবে।

(৪) দারোয়ান শ্রমিকদের মোট বেতন বৃদ্ধি হবে ৪০০ টাকা। যা প্রথম বছর ২০১৩-১৪ এবং দ্বিতীয় বছর ২০১৪-১৫ সালে যথাক্রমে ২০০ টাকা এবং ২০০ টাকা দেওয়া হবে। ড্রাইভার শ্রমিকদেরও একইভাবে মজুরি বৃদ্ধির পরিমাণ হবে ২০১৩-১৪ সালে ১৫ শতাংশ এবং ২০১৪-১৫ সালে ১২ শতাংশ হারে।

(৫) এই চুক্তির সময়কালে মজুরি সংক্রান্ত কোন দাবি উত্থাপন বা আলোচনা করা যাবে না।

(৬) ভাটায় কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চালানো এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মজদুর ইউনিয়ন এবং ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন উভয়পক্ষ সজাগ থাকবে। যে কোন সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের জন্য উভয়পক্ষ সম্মতি জ্ঞাপন করেছে।

চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন মজদুর ইউনিয়নের পক্ষে সম্পাদক সেখ আব্দুল মজিদ, সভাপতি নারায়ণ রায় এবং ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সম্পাদক নারায়ণ সিং মহঃ সিরাজউদ্দিন প্রমুখ। মজুরি চুক্তি আলোচনায় মধ্যস্থতাকারির ভূমিকা পালন করেন এ আই সি সি টি ইউ উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক নবেন্দু দাশগুপ্ত।

সি পি আই (এম এল) কেন্দ্রীয় কমিটি প্রকাশিত
ইংরাজী সাপ্তাহিক ''আপডেট''
গ্রাহক মূল্য ঃ ৫০ টাকা

... মহিলা সমিতির ৯ম রাজ্য সম্মেলন

একের পাতার পর

৬ দফা কর্মসূচী ঘোষিত হয় প্রতিবেদনে।

৭টি জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন শ্রমজীবী নারী ও ছাত্রীরাও। মোট ১৮ জন প্রতিনিধি তাঁদের বক্তব্য বিভিন্ন দিক থেকে তুলে ধরেন। প্রতিবিধান পত্রিকাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট বক্তব্য উঠে আসে। পরিচারিকা কল্যাণ সমিতির কাঠামোকে শক্তিশালী করার কথা। হুগলীর জেলা নেত্রী মহিলা সমিতির ব্লক ভিত্তিক কর্মসূচী ও উদ্যোগ গ্রহণের উল্লেখ করেন। ছাত্রী প্রতিনিধিরা লিঙ্গ হিংসার বিরুদ্ধে মহিলা সংগঠন ও ছাত্র সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। ৩৭৭ ধারার কথাও উল্লেখ করেন। হুগলীতে দুষ্কৃতির দ্বারা ধর্ষিতা নাবালিকার মা কিভাবে বহু চাপ ও আক্রমণের মধ্যেও ন্যায় বিচারের জন্য তিনি লড়াই চালাচ্ছেন—সেই অভিজ্ঞতা মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরেন। প্রতিটি বক্তাই তাদের বক্তব্যে বর্তমান তৃণমূল সরকারের ধর্ষণকারীদের মদতদাতা ও পুরুষতন্ত্রের রক্ষক হিসাবে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতাকে খর্ব ও দলিত করার ভূমিকাকে তুলে ধরেন। তাঁরা ধর্ষণকারীদের দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলে ধরেন। পরিচারিকাদের ট্রেড ইউনিয়নভুক্ত করার কথা এসেছে। গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে স্বাধীন উদ্যোগে কর্মসূচী নেওয়ার পাশাপাশি সহমতের ভিত্তিতে যৌথ কর্মসূচী নেওয়ার। এ আই সি সি টি ইউ এবং নারী আন্দোলনের নেত্রী মীনা পাল ৮ মার্চের ইতিহাসের উল্লেখ করে শ্রমজীবী নারীদের অধিকার আন্দোলনের পাশাপাশি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং বৈষম্য ও সমানাধিকারের লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

প্রতিবেদন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার পর ৪৭ জনের কাউন্সিল ও ২১ জনের কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। ৭ সদস্যের ভারপ্রাপ্তদের মধ্যে গৌরী দে সভানেত্রী, সহ-সভানেত্রী, চৈতালী সেন সম্পাদিকা, সহ-সম্পাদিকা ইন্দ্রাণী দত্ত ও অর্চনা ঘটক, কোষাধ্যক্ষ কল্যাণী গোস্বামী এবং চন্দ্রাস্মিতা চৌধুরী অফিস সচিব পদে দায়িত্ব পান।

সম্মেলনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন ৭ জনের সভানেত্রীমণ্ডলী ও ৩ জনের সঞ্চালনা কমিটি। সভানেত্রীমণ্ডলীতে সদস্যরা ছিলেন গৌরী দে, ইন্দ্রাণী দত্ত, কাজল দত্ত, জয়শ্রী দাস, সন্ধ্যা দাস, শোভা ব্যানার্জী ও বীথিকা বসু। সঞ্চালক কমিটিতে ছিলেন মমতা ঘোষ, সুনেত্রা সেনগুপ্ত ও কস্তুরী।

বৃহত্তর সংগ্রামের প্রত্যয় ও শপথ নিয়ে ৯ম রাজ্য সম্মেলন শেষ হয় ''আমরা করব জয় নিশ্চয়'' গান গেয়ে। সম্মেলনের পর এক দৃপ্ত মিছিল কক্ষ থেকে বের হয়ে কলেজ স্ট্রীট পর্যন্ত যায়। ঐতিহাসিক ৮ মার্চ, নারী মুক্তি ও নির্ভয় স্বাধীনতার শ্লোগান ওঠে। ছাত্র সাথীরাও মিছিলে যুক্ত হন। মিছিলের শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জাতীয় নেত্রী কবিতা কৃষ্ণাণ।

জলাশয় সংরক্ষণের দাবিতে পৌরসভায় ডেপুটেশন

পূর্ব বেহালা অঞ্চলে কলকাতা পৌরসভার অধীন স্থানীয় ১২১, ১২২, ১২৩ নং ওয়ার্ডের জলাশয় (পুকুর) জনগণের স্বার্থে সংরক্ষিত করার দাবিতে কলকাতা নাগরিক সমন্বয় মঞ্চের নেতৃত্বে দীর্ঘদিন ধরে লাগাতার প্রচার, আন্দোলন ও স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চলছে। এই কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে গত ১১ মার্চ কলকাতা নাগরিক সমন্বয়ের বেহালা শাখার দায়িত্বশীল গোবিন্দ মান্নার নেতৃত্বে ৩ জনের একটি প্রতিনিধিদল কলকাতা পৌরসভার কমিশনার শ্রী খলিল আহমেদের সঙ্গে দেখা করে ৩ হাজার গণস্বাক্ষর সহ দাবিপত্র পেশ করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন গোবিন্দ মান্না, মিথিলেশ সিং ও রঞ্জিত কর্মকার। কমিশনারের সাথে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা হয়। তিনি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে (জলাশয়) ডেকে পাঠান এবং আলোচনার ভিত্তিতে প্রতিশ্রুতি দেন লোকসভা নির্বাচনের পর জলাশয় সংরক্ষণ করার কাজ শুরু করবেন।

''আজকের দেশব্রতী''
বিশেষ সংখ্যা ২০১৪
এখনও পাওয়া যাচ্ছে
দ্রুত সংগ্রহ করুন
গ্রাহক হোন

আন্তর্জাতিক

ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বকে অগ্রাহ্য করে চলছে রুশ-মার্কিন অক্ষের দ্বৈরথ

সাম্প্রতিক সময়ে ইউক্রেন বিশেষত তার দক্ষিণ অংশ ক্রিমিয়াকে ঘিরে মার্কিন-ন্যাটো অক্ষের সঙ্গে রাশিয়ার দ্বন্দ্ব ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরবর্তী পর্যায়ে সবচেয়ে তীব্র চেহারা নিয়ে সামনে এসেছে। ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ ও রাশিয়া বিরোধী অক্ষের ক্ষমতা দখলের পর রাশিয়া ইউক্রেন ঘিরে সেনা সমাবেশ করে। এর পরেই মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি রাশিয়াকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'পশ্চিমী শক্তি প্রস্তুত। ইউক্রেনে যে কোনও ধরণের সামরিক আগ্রাসনের দায়ে রাশিয়াকে একঘরে করে দেওয়ার জন্য পশ্চিমের শক্তিগুলো সর্বাত্মক পদক্ষেপ নেবে'। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুমকি, তার মিত্রদের তৎপরতা কোনও কিছুই রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে দমাতে পারেনি। রুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পন্ন ইউক্রেনের ক্রিমিয়ায় রাশিয়ার সেনবাহিনী অবস্থান নিয়েছে। পশ্চিমের হুমকির মধ্যে রাশিয়ার এই অপারেশনটি হয়েছে রক্তপাতহীন এবং নিতান্তই ছোটখাটো সামরিক অভ্যুত্থানের মত। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসের খোঁজখবর যারা রাখেন তারা শঙ্কিত হচ্ছেন এই ভেবে যে, এই ধরনের সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই বিশ্ব অনেক বড় বড় সামরিক যুদ্ধের পথে হেঁটে গেছে।

স্বাভাবিকভাবেই দুনিয়াজোড়া বৈদুতিন মাধ্যমের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আর পত্রপত্রিকাগুলোর খবর আর মতামতের পাতায় এখন 'আরেকটি দীর্ঘস্থায়ী স্নায়ুযুদ্ধ কি আসন্ন(?)' বলে প্রশ্ন ওঠা শুরু হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে এর প্রেক্ষাপটটা বুঝে নেওয়া জরুরী।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের পর 'গণতন্ত্রের মুক্তি' সংক্রান্ত কিছুদিনের উচ্ছ্বাসপর্ব কাটিয়ে পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ দ্রুতই নিজেদের এক বিপর্যস্ত আর্থিক স্থিতির মধ্যে খুঁজে পায়। সাম্প্রতিক সময়ের অর্থনৈতিক মন্দা তাকেই আরও ঘনীভূত করে। রাশিয়ার প্রতিবেশী ইউক্রেনও এর ব্যতিক্রম নয়। মাথাপিছু আয়ের নিরীখে সোভিয়েত জমানায় যে ইউক্রেন গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানীর মতো দেশের থেকেও অনেকটা এগিয়ে ছিল, এখন তারই এক ভয়াবহ দশা। একসময় উৎপাদন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভারী শিল্প থেকে কৃষি ভিত্তিক শিল্পে যে ইউক্রেন বিশিষ্ট জায়গায় পৌঁছেছিল, গত দু-দশকে সেই উৎপাদন ক্ষেত্রেই দেখা দিয়েছে চরম বিশৃঙ্খলা। সোভিয়েত জমানার তুলনায় শিল্প-উৎপাদন ক্ষেত্রে পতনের হার পৌঁছেছে আঠাশ শতাংশে, কৃষিক্ষেত্রেও উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে লাগামছাড়াভাবে বেড়েছে ড্রাগের নেশা, পতিতাবৃত্তি।

নব্য উদার অর্থনীতির ইউক্রেনে স্বাভাবিকভাবেই নয়া জমানা ও তার শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। এই ক্ষোভ আরও বাড়ে সাম্প্রতিক আর্থিক সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে দক্ষিণপন্থী অর্থশাস্ত্রী ও রাজনীতিবিদদের দেওয়া দাওয়াই 'আর্থিক কৃচ্ছসাধন নীতি' গ্রহণের পর। স্বাস্থ্য, আবাসন ও বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা খাতে সরকারি ব্যয় বরাদ্দ কমিয়ে সেগুলোকে আরও বেশি বাজারমুখী করে তোলা হয়। নয়া করনীতির ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে মারাত্মকভাবে আর তা সরাসরি সাধারণ মানুষকে আঘাত করে। উল্টোদিকে শাসক ঘনিষ্ঠ পুঁজিপতিদের জন্য ঢালাও ভর্তুকির ব্যবস্থা করা হয়। গ্যাসের দাম মেটানো, আই এম এফের ঋণ মেটানো ইত্যাদি প্রয়োজনে ইউক্রেনের দরকার পড়ে প্রায় পনেরোশো কোটি ডলার। দেশের সঞ্চিত বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডার নেমে আসে বারোশো কোটি ডলারে। বিপর্যস্ত আর্থিক পরিস্থিতি, মূল্যবৃদ্ধি ও সরকারি ব্যয়সঙ্কোচ নীতির বিরুদ্ধে ৩০ নভেম্বর যুবদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের ওপর সরকার দমন নামিয়ে আনলে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হতে শুরু করে।

দেশের আর্থিক সঙ্কটের জন্য ঘনীভূত জনগণের উদ্বেগকে বোঝার চেষ্টা না করে সরকার চেষ্টা করে একদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে কিছু সমঝোতা সাধনের মধ্য দিয়ে একটা জোড়াতালি দেওয়া সমাধানের। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়ন কড়া কৃচ্ছসাধন নীতি গ্রহণ তথা সামাজিক ব্যয়কে ব্যাপকভাবে কমানোর জন্য রাষ্ট্রপতি ইয়ানুকোভিচ ও ইউক্রেন সরকারের ওপর চাপ বাড়াতে থাকে। গণক্ষোভের ভয়ে ইয়ানুকোভিচ ইউরোপীয় ইউনিয়নের থেকে দূরত্ব স্থাপন করে আবার রাশিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে উদ্যোগী হন। রাশিয়া আগে ইউক্রেনকে পনেরোশো কোটি ডলার ঋণ ও সস্তায় গ্যাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ইউক্রেনের ঘনিষ্ঠতা পর্বে তারা ইউক্রেনকে সাহায্যের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে। ইয়ানুকোভিচ নতুন করে এই সাহায্য পাওয়ার ব্যাপারে উদগ্রীব হন।

রাশিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন উভয়ের কাছেই ভূ-রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক প্রশ্নে ইউক্রেনের মিত্রতা বিশেষ কাঙ্খিত। রাশিয়া ও বাকী ইউরোপের মধ্যে ইউক্রেন একটি বাফার জোন হিসেবে কাজ করে। ইউক্রেনের মধ্যে দিয়েই রাশিয়ার অন্যতম রপ্তানী পণ্য প্রাকৃতিক গ্যাস জার্মানী সহ ইউরোপের দেশগুলোর কাছে পৌঁছায়। ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের জায়গা থেকে মার্কিন অক্ষ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো স্বাভাবিকভাবেই ইউরোপীয় ইউনিয়ন এমনকী ন্যাটোর মধ্যেও ইউক্রেনকে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। বিপ্রতীপে রাশিয়াও একই কারণে ইউক্রেনের ওপর তার প্রভাব জারী রাখতে সক্রিয়।

ইউক্রেনের ওপর প্রভাবের আধিপত্য নিয়ে কানাডা ও মার্কিন মদতপুষ্ট ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে রাশিয়ার দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নে ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা তৈরি হতেই সেই দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছয় এবং রাশিয়া পাল্টা আগ্রাসন শুরু করে। সস্তা গ্যাস ও কম সুদে ঋণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইউক্রেনের আনুগত্য হাসিল করতে চায়। রাশিয়া ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের লড়াইয়ে বলি হতে থাকে ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব ও তার স্বাধীন বিদেশ নীতি।

এই সময়ে ইউক্রেনের আর্থিক সঙ্কট ও সরকারি দমননীতির বিরুদ্ধে জনগণ বিশেষত যুবদের চাপা ক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে। দেশের অভ্যন্তরে সক্রিয় মার্কিন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটো ঘনিষ্ঠ এবং তাদের মদতপুষ্ট শক্তিও ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানে রাষ্ট্রপতি ইয়ানুকোভিচের অসম্মতির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করে। ১৮ ফেব্রুয়ারী থেকে আন্দোলন এবং তাকে রুখতে সরকারি দমন ক্রমশ সহিংস হয়ে ওঠে এবং গোটা দেশের কোনও কোনও অংশে এমনকি গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রতিবাদী ও পুলিশ মিলিয়ে প্রায় শ খানেক মানুষের মৃত্যু হয়, এগারোশো-র বেশি মানুষ আহত হন। ২১ ফেব্রুয়ারী রাষ্ট্রপতি ইয়ানুকোভিচ বিরোধীদের সঙ্গে একটি চুক্তি সই করেন, যাতে সংবিধান সংশোধন করে সংসদের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়া ও দ্রুত নির্বাচন সংগঠিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু এতেও বিক্ষোভ প্রশমিত হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভ মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে ইয়ানুকোভিচ দেশ ত্যাগ করেন এবং রাশিয়ায় আশ্রয় নেন। ২২ ফেব্রুয়ারী ইউক্রেনের সংসদ ইয়ানুকোভিচকে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে বরখাস্ত করে এবং স্পিকার তুর্চিনভকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তৈরি করে। ২৫ মে পরবর্তী নির্বাচনের দিন স্থির করা হয়।

ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে রাশিয়া বিরোধী এবং মার্কিন ও ন্যাটো পন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও দেশের সর্বত্র তারা আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। এমত পরিস্থিতিতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ার সংসদের কাছে ইউক্রেনে সেনা প্রেরণের অনুমতি চান এবং ১ মার্চ রাশিয়ার সংসদ ইউক্রেনে সেনা পাঠানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ইউক্রেনের দক্ষিণাংশে ক্রিমিয়ায় রুশ সৈন্য প্রবেশ করে। রুশ বিদেশমন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'ইউক্রেনে বসবাসকারী রুশ জনজাতির অধিকার রক্ষায় আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসার সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে আমাদের, তবে এটাকে সেনা আগ্রাসন বলা হবে কিনা তা নিয়ে কূটনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু হয়। মনে রাখা দরকার রুশ ভাষাভাষী ও জাতিসত্তা প্রধান ক্রিমিয়ায় রুশ সেনার উপস্থিতির বিষয়টি নিয়ে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে ১৯৯৭ সালে একটি চুক্তি হয়, যার পুনর্নবীকরণ হয় ২০১০ সালে। এই চুক্তি অনুযায়ী ২০৪২ সাল পর্যন্ত রাশিয়া ক্রিমিয়া ও সেভাস্তিপুলে ২৫০০০ সেনা মোতায়েন রাখতে পারে। রুশ ভাষাভাষিদের জান-মান রক্ষার কথা বলে কেন রাশিয়া ক্রিমিয়ায় সেনা পাঠালো আর তার রাজনৈতিক ও রণনৈতিক ফলাফল কি হতে চলেছে, তা ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক দুনিয়ার প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

রাশিয়া কেন প্রতিবেশী একটি রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ করতে গেল? সেটা কি কেবলই রাশিয়ার আগ্রাসী চরিত্রের কারণে (যেমনটি বলছেন জন কেরি ও তার পশ্চিমী মিত্ররা)? ইনস্টিটিউট ফর পলিটিক্যাল স্টাডিস ইন মস্কোর পরিচালক ও ক্রেমলিনের উপদেষ্টা সারগেই মারকভ এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্লুমবার্গ নিউজকে তিনি বলেছেন, পশ্চিমের শক্তিগুলো আসলে মস্কোর বাড়ির পাশে রাশিয়া বিরোধী একটি শক্তি গড়ে তুলছিল। 'দেখি কি হয়' নীতি নিয়ে অপেক্ষায় থাকতে চাননি পুতিন। তিনি ভবিষ্যতে বড় শত্রুর সঙ্গে বড় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে এই মুহূর্তের ছোটো যুদ্ধটাই বেছে নিয়েছেন। এই লড়াইটা তাকে একটা সময় করতেই হত।

ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপের পরিণতিতে কী ঘটবে? পরাশক্তিগুলো কি নতুন করে বিবাদে জড়িয়ে পড়বে? কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার কঠোর গলায় বলেছেন, ইউক্রেনের ঘটনা বিশ্বশান্তিকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তিনি এ-ও বলেছেন, অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিকভাবে রাশিয়া নিজেদের একলা করে ফেলার ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি জি-৮ থেকে রাশিয়াকে বহিষ্কারের হুমকি দিয়েছিলেন। তার বক্তব্য প্রচারিত হওয়ার পরপরই জি-৮ দেশগুলোর অন্যতম সদস্য জার্মানি জন কেরির বক্তব্যকে সমর্থন করে না বলে প্রকাশ্যেই জানিয়েছে। জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্যাঙ্ক ওয়েল্টার এ এফ পি-কে বলেছেন, রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমের কথাবার্তা বলার একমাত্র ফোরাম হচ্ছে জি-৮। রাশিয়ানদের সঙ্গে যোগসূত্রের এই সুযোগটা হাতছাড়া করা পশ্চিমীদের ঠিক হবে না। জার্মানির এই বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে দেখছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা। মনে রাখতে হবে জার্মানী তার জ্বালানির জন্য রাশিয়া থেকে প্রচুর পরিমাণ গ্যাস আমদানি করে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জি-৮ গ্রুপ থেকে কাউকে বহিষ্কারের জন্য সকল সদস্যের ঐকমত্য হতে হয়। জার্মানি যখন বিরোধিতা করেছে, তখন অন্তত বহিষ্কারের ঘটনা ঘটছে না। অন্টারিওভিত্তিক সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল গভরনেন্স ইনোভেটিভের পরিচালক ফ্যান হ্যামফেন গ্লোব অ্যাণ্ড মেইলকে বলেছেন, শিল্পোন্নত দেশগুলোর এই ফোরাম গড়ে উঠেছে কোনও ধরণের লিখিত নিয়মাবলী, কমিটি, উপকমিটি ছাড়াই। এর সদস্য হওয়া না হওয়া নিয়ে কোনও লিখিত বিধি-বিধান নেই। তবে একটা নীতি এই ফোরাম অনুসরণ করে; তা হল আলোচনার টেবিলে ওঠানো কোনও ইস্যুর ব্যাপারে সদস্য কোনও একটি দেশও যদি আপত্তি বা অনাগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে সেই ইস্যু নিয়ে ফোরামটি আর অগ্রসর হয় না। ফ্যান হ্যামফেন বলছেন, জার্মানির জন্য রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্য, বিনিয়োগের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে জার্মানিকে রাশিয়ার ওপর নির্ভর করতে হয়।

তাহলে কী ঘটবে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে? রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাল্টা কোনও সামরিক অভিযান যে হচ্ছে না সেটি প্রায় নিশ্চিত। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী উলিয়াম হ্যাগ নিশ্চিত করেছেন যে, তারা সামরিক কোনও অভিযানের বিষয় মাথায় নেননি। কানাডা এমনকি ন্যাটোও সামরিক অভিযানের ব্যাপারে আগ্রহী নয়। তাদের আগ্রহ অর্থনৈতিক এবং কূটনৈতিক পদক্ষেপে। কিন্তু সেটি কতটা সফল হবে?

জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্রাঙ্ক ওয়াল্টারকেই উদ্ধৃত করা যাক—'বার্লিন দেওয়ালের পতনের পর গত পঁচিশ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ সংকটে পড়েছে ইউরোপ। সেই সময়কার বিরোধটা ছিল পূর্ব আর পশ্চিমের। আর এখন ইউরোপই বিভক্তির মুখে'। তিনি বলেন, 'পশ্চিম থেকে যত সতর্কতা হুমকি দেওয়া হোক না কেন, রাশিয়া তার কাজ কিন্তু বন্ধ করছে না। বরং রাশিয়ার কণ্ঠস্বর উচ্চ থেকে উচ্চতর হচ্ছে'।

তবে রাশিয়া ইউক্রেনের সঙ্গে আলাপ আলোচনার রাস্তা থেকে একেবারে সরে আসার কোনও লক্ষণ দেখায়নি। রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেগেই ল্যাভরভ বলেছেন, ''ভূ-রাজনৈতিক দুর্বল কারণে কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে ইউক্রেন সঙ্কট''। তাঁর মতে ইউক্রেনের অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে রাশিয়ার যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ পড়েছে রুশ বিরোধী কট্টরপন্থীদের হাতে। পশ্চিমীরা যদি সত্যিকার অর্থে চায় তাহলে আরও অবাধ আলোচনায় বসতে রাজি আছে রাশিয়া। ওদিকে ইউক্রেনের অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদ্রি দেশচিতসায়া আশা প্রকাশ করেছেন যে, রাশিয়া আলোচনায় এগিয়ে আসবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি আরও বলেন, 'আমরা রাশিয়ানদের সঙ্গে বসিওনি। তাদের সঙ্গে কথাও হয়নি। কিন্তু মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে আমাদের বার্তা তাদের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি। তারা আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। সুতরাং কিছু একটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে'। তবে সেই প্রস্তাবে কি বলা হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত কিছু বলেননি।

ইতোমধ্যে ১৬ মার্চ ক্রিমিয়ায় সংগঠিত হয়েছে গণভোট, যার বিষয় ক্রিমিয়া রাশিয়াতে সংযুক্ত হতে চায়, না ইউক্রেনের অন্তর্ভুক্ত থাকতে চায়। এই ভোটের ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে উদগ্রীব হয়ে আছে ক্রিমিয়া রাজ্যের অধিকাংশ জনগণ। ক্রিমিয়ার পার্লামেন্ট ভোটাভুটির মাধ্যমে আগেই এই কথা জানিয়ে দিয়েছে। আর সে সিদ্ধান্ত পাকা করতেই সেখানে গণভোট সম্পন্ন হয়েছে। এই গণভোটের রায় পক্ষে যাওয়ায় ক্রিমিয়া যোগ দিতে চাইছে রাশিয়ার সঙ্গে। তবে আমেরিকা ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের

আটের পাতায় দেখুন

‘‘উই শ্যাল ওভারকাম ...’’

গিটার বা ব্যাঞ্জোর অনুসঙ্গে তাঁর গানগুলো হয়ে উঠেছিল সময়ের দর্পণ; পঞ্চাশের দশকে শ্রম বিপ্লবে, ষাটের দশকে মানবাধিকারের দাবিতে, সত্তর ও পরবর্তী যুদ্ধবিরোধী ও পরিবেশ সচেতনতায়। আমেরিকায় সিভিল রাইটস মুভমেন্ট চলাকালীন মার্টিন লুথার কিং-এর একটি সমাবেশে পিট সিগার প্রথমবার গাইলেন বহুদিন আগেকার গসপেল প্রভাবিত গান ‘‘উই শ্যাল ওভারকাম সাম ডে ...’’। রেভারেণ্ড চার্লস টিণ্ডলের সংকলিত গান ‘‘আই উইল ওভারকাম সাম ডে ...’’ গানটি পিট সিগার শুনেছিলেন তামাক চাষীদের মুখে। পিট ঐ গানের কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করে দেন এবং একটি নতুন স্তবক জুড়ে দেন মূল গানটির সঙ্গে। বাকিটা ইতিহাস। এই গানটি ‘দ্য উইভার্স’-এর পক্ষ থেকে সিভিল রাইটস আন্দোলনের বহু সভা, সমাবেশ, র‍্যালি ও কনসার্ট হলে গাওয়া হতে থাকে। গানটি হয়ে ওঠে সিভিল রাইটস আন্দোলনের এ্যান্থেম। বিশ্বজুড়ে অসংখ্য ভাষায় অনুবাদ হয় গানটির। ১৯৬৫ সালে অনুবাদ করেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। কবি গিরিজা কুমার মাথুরের হিন্দি অনুবাদ ‘‘হাম হোঙ্গে কামিয়াব এক দিন ...’’ ’৮০-র দশকে এক স্বদেশপ্রেমী সঙ্গীত হিসাবে খ্যাত হয়। হালে মাই নেম ইজ খান সিনেমায় এই গানটি ব্যবহার করা হয়েছে।

এই বছরের ২৭ জানুয়ারী ৯৪ বছর বয়সে নিউ ইয়র্কে এই প্রবাদপ্রতীম মহীরূহসম মানুষটির জীবনাবসান হল। আজীবন প্রতিবাদী এই মানুষটি সরকারি বদান্যতাকে ঘৃণা করতেন। এমনকি একটি সিগারেট কোম্পানীর বিজ্ঞাপন করার প্রতিবাদে তিনি নিজের দল ‘‘দ্য উইভার্স’’ ছেড়ে বেড়িয়ে আসেন। তাঁর একটি লেখায় প্রাচীন আরবি প্রবাদ উল্লেখ করে বলেছিলেন, ‘‘রাজা যখন কোন শিল্পীকে অনুগ্রহ দেখায় তার আগে তার জিভটা টেনে ছিঁড়ে নেয়।’’ তাঁর এই প্রতিবাদী প্রতিষ্ঠান বিরোধী অবস্থানের সঙ্গে মিলে যায় এদেশের জনপ্রিয় কবিয়াল ভোলা ময়রার সেই বিখ্যাত উক্তি, ‘‘ব্যাটা কবি গাইবি পয়সা নিবি, তোষামুদির কি কারণ। কেমন করে বললি জগা ...’’। পশ্চিমবঙ্গ গণ সংস্কৃতি পরিষদ পিট সিগারের এই সংস্কৃতি ভাবনার উত্তরসূরী। ‘‘গণসংগ্রাম থেকে দূরে থেকে গণ সংস্কৃতি হয় না’’—এই ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে সৃজনের শপথ নেওয়ার জন্যই পিট সিগারকে শ্রদ্ধা জানাতে গত ৭ মার্চ কলকাতা স্টুডেন্টস হলে আয়োজিত হল পিট সিগার স্মরণ অনুষ্ঠানের। কথায় গানে অংশগ্রহণ করলেন সেইসব জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত, গণসঙ্গীত শিল্পীরা যারা সরকারি অর্থানুকুল্য ছাড়াই বাঁচিয়ে রেখেছেন বিগত দশকগুলোতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে মানুষের অধিকার ও মর্যাদার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন থেকে উঠে আসা গানগুলোকে। আজ যখন সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী একদা বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা উল্টোদিকে যাত্রা শুরু করেছেন তখন এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। অনুষ্ঠান মঞ্চে ফ্যাসিবাদ বিরোধী চিত্র পরিচালক সদ্য প্রয়াত অঁল্যা রেনে ও গিটারিস্ট পাকো দ্য লুসিয়ার ছবি টাঙানো ছিল।

ওয়ালস্ট্রীট আন্দোলনে গিটার হাতে হাজির ছিলেন নবতিপর পিট। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে ‘‘আমরা ৯৯, তোমরা শুধু ১’’ গেয়ে শোনালো নৈহাটির অগ্নিবীণা। গিটার হাতে কঙ্কন ভট্টাচার্য শোনালেন রকগায়ক ব্রুস স্প্রিংস্টিনের অ্যালব্যাম থেকে সংগ্রহ করা পিটের বেশ কিছু গানের অনুবাদ। ১৯৯৬ সালে পিট সিগার কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁকে শোনানো হয়েছিল নিবারণ পণ্ডিতের গান ‘‘মুর্খ গীদাল হামলরাগুলা ভাওয়াইয়াগান গাই ...’’-এর অনুবাদ। জরুরী অবস্থার সময় প্রেস সেন্সরশিপ ও মানবাধিকার হরণের প্রতিবাদে রচিত এই গানটি পিট সিগারের মতে দুনিয়ার সেরা দশটি গণসঙ্গীত সংগ্রহের মধ্যে অন্যতম—জানালেন শ্রী কঙ্কন ভট্টাচার্য। রাকা ভট্টাচার্য গাইলেন যুদ্ধবিরোধী গান ‘‘হোয়্যার হ্যাভ অল দি ফ্লাওয়ার্স গন ...’’—অনুবাদ হেমাঙ্গ বিশ্বাস। যুদ্ধ শুরু হলে রাস্তায় ফুল দেখা যায় না—সব চলে যায় মৃত সৈনিকের কবরে। মিখাইল সলোকভের ‘‘ধীর বহে ডন’’ উপন্যাসটি ছিল পিটের অনুপ্রেরণা। জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত শিল্পী অভিজিৎ বসুর কণ্ঠে শোনা গেল হোসে মার্তির রচিত স্প্যানিশ গান গুয়ানতোনা মেরা। শোনা গেল আমেরিকার ফোক রিভাইভালের কাহিনী। পিট সিগার সমগ্র মানবজাতিকে রেনবোরেস বলে বর্ণনা করেছেন। বিষয়টি মাথায় রেখে বিপুল চক্রবর্তী, অনুশ্রী চক্রবর্তী গাইলেন কয়েকটি স্বরচিত গান, সঙ্গে গুয়ানতানামেরার বাংলা অনুবাদ। অনুষ্ঠান জমিয়ে দিয়েছিলেন গিটার হাতে শ্রী রঞ্জন প্রসাদ। ফোক রিভাইভালের যুগে সঙ্গীত জগতে তখন এসে গিয়েছেন বব ডিলান, জোন বায়েজ, পিটার পল অ্যাণ্ড মেরী, দ্য বার্ডস। রঞ্জন প্রসাদ গাইলেন পিটের তৈরী গান ‘‘ইফ আই হ্যাড এ হ্যামার ...’’। সেই সময় ম্যালভিনা রেনল্ডস্-এর ‘লিটল বক্সেস’ গানটির অনুবাদ। অনুবাদক তিনিই। শ্রোতাদের মন কেড়ে নিলেন তিনি। তরুণ শিল্পী আকাশ-প্রতীক গেয়ে শোনালেন বব ডিলানের ‘‘হাউ মেনি মাইলস্ মাস্ট এ ম্যান ওয়াক ডাউন।’’ পরিষদের শিল্পী বাবুনি মজুমদার কঙ্কন ভট্টাচার্যের গল্পের রেশ ধরে গেয়ে শোনালেন নিবারণ পণ্ডিতের লেখা সেই গান। অনুষ্ঠনের অন্তিমলগ্নে মহিলা কবি অদিতি সেন চট্টোপাধ্যায় গেয়ে শোনালেন উডি গাথরির রচনা ‘‘দিস ল্যাণ্ড ইউ মাই ল্যাণ্ড/দিস ল্যাণ্ড ইজ ইয়োর ল্যাণ্ড ...’’ গানটি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই গানটি হিন্দিতে ভাবানুবাদ করেছেন সঙ্গীতশিল্পী শ্রী সুস্মিত বসু। পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের সংগ্রহশালায় এই গানটিও এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হতে পারে। অদিতির সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইলেন শ্রী অসীম গিরি।

অনুষ্ঠান শেষ হল শ্রোতা ও শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠে ‘‘উই শ্যাল ওভারকাম ...’’ গানের মধ্য দিয়ে। গিটার হাতে দেখা গেল পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক ও অনুষ্ঠানের সঞ্চালক শ্রী নীতীশ রায়কে, যা এক বিরল দৃশ্য। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রচারিত বক্তব্যে গণসংস্কৃতি পরিষদ উডি গারথির অনুপ্রেরণায় বলেছেন, ‘‘যেখানে শুধুই শিশুদের ক্ষুধার্ত চিৎকার/যেখানে সংগ্রাম স্বাধীনতার/যেখানে শ্রমিক লড়াই করে কাড়ে অধিকার’’/সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন পিট সিগার। - **শান্তনু ভট্টাচার্য**

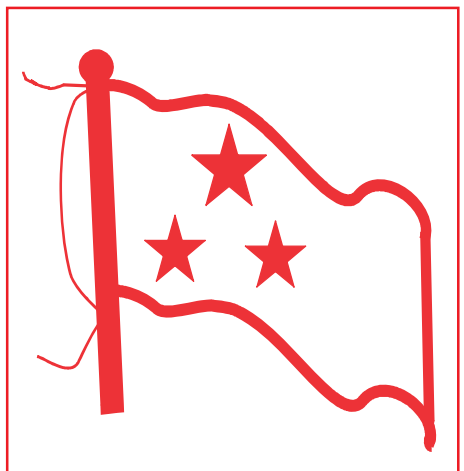

সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন

শোক সংবাদ

চলে গেলেন কমরেড সাধন কুণ্ডু (ঝন্টু)

গত ৯ মার্চ সকাল ৯-৪৫ মিনিটে নদীয়ার শান্তিপুরে নিজ বাসভবনে কমরেড সাধন কুণ্ডু মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে মাত্র ৫৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৭৭-৭৮-এর সন্ধিক্ষণে পার্টি আমাদের কয়েক জন কমরেডকে নদীয়ায় প্রায় শূন্য থেকে শুরু করতে সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব দিয়ে পাঠায়। সেই সময়েই কমরেড সাধনের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে তাঁর পিসিমা, বাবা, মা ও ভাইদের নিয়ে তাদের পরিবারের ছেলে সাধন জীবিকার জন্য তাঁত বোনার কাজ করতেন। প্রচণ্ড দারিদ্র ও কষ্টের মধ্যেও বিপ্লব ও পার্টির জন্য গরিব মানুষের মধ্যে সংগ্রাম ও সংগঠন গড়ে তোলার জন্য সাধন বাড়ি ঘর ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পার্টিতে তিনি পরিচিত ছিলেন কমরেড ঝন্টু নামে। ওঁর সহজ-সরল জীবনযাত্রার সাথে চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে সবকিছু সরলভাবে বিচার করতেন। যৌথ সিদ্ধান্ত যা হত তা কিন্তু নিষ্ঠার সাথে পালন করতেন। ঐ দিনগুলোতে ঝন্টু বুনিয়াদী শ্রেণীর জনগণ গরিব ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে কাজ করায় বেশী উৎসাহী ছিলেন। পরবর্তীতে আই পি এফ-এর পরিচালনায় সংগঠন ও সংগ্রাম গড়ে তোলার কাজে ঝন্টু ছিলেন খুবই সক্রিয়। বহু বছর যাবত শান্তিপুরের কয়েকজন গণতান্ত্রিক ব্যক্তির সাথে ঝন্টু ‘চেতনা’ নামে একটা স্থানীয় পত্রিকা প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

আজ সংগঠনের অনেক বিস্তার হয়েছে, তার মধ্যে বহু গ্রামে সেই দিনগুলোতে বুনিয়াদী শ্রেণীর মধ্যে কমরেড ঝন্টুর সংগঠন গড়ে তোলার কাজে অনেক ভূমিকা ছিল। নদীয়া জেলায় পার্টিতে বর্তমানে যারা নতুন কর্মী ও নেতা, তাঁদের ঝন্টুর মত কমরেডের কাছ থেকে অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করার রয়েছে। স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা ও ভাইদের পরিবার এবং পার্টির অগণিত কর্মী-সমর্থক জনগণকে রেখে অকালে ঝন্টু প্রয়াত হলেন। আমরা তাঁর পরিবারের শোকের সমান অংশীদার।

কমরেড ঝন্টু লাল সেলাম!

- সুদর্শন বসু

চলে গেলেন কমরেড কিশোরী গায়েন

বেহালার বর্ষীয়ান পার্টি সদস্য কমরেড কিশোরী গায়েন বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে গত ৪ মার্চ দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর, তিনি মৃত্যুকাল তিন কন্যা, দুই পুত্র ও স্ত্রীকে রেখে গেছেন। দশ বছর আগে রেশনে কেরোসিন দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের সময় সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। সিঙ্গুর আন্দোলনের মিছিলে তিনি একাধিকবার অংশগ্রহণ করেন। মাসখানেক আগেও তিনি প্রায়শই পার্টির বিভিন্ন কর্মসূচীর খোঁজখবর রাখতেন। পেশায় দিনমজুর হলেও কাজ কামাই করে কর্মসূচীতে যোগ দিতেন। তাঁর ব্যবহার ও সংগ্রামী মেজাজ বহু মানুষকে সাহস যোগাত। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। বেহালার বহু পার্টি সদস্য ও স্থানীয় মানুষ তাঁর শেষকৃত্যে যোগ দেন। কমরেড কিশোরী গায়েনের মৃত্যু পার্টির কমরেডদের কাছে এক অপূরণীয় ক্ষতি। পার্টি কমরেডরা প্রয়াত কমরেড কিশোরীদার পরিবারের প্রতি শোক জ্ঞাপন করছে।

ইউক্রেনের ... রুশ-মার্কিন অক্ষের দ্বৈরথ

সাতের পাতার পর

হুঁশিয়ারি অগ্রাহ্য করেই এই জনমত নেওয়ার দিকে এগিয়েছে ক্রিমিয়ার স্থানীয় প্রশাসন। ইউক্রেন ছেড়ে রাশিয়ায় যোগ দেওয়ার প্রশ্নে রবিবার ক্রিমিয়ায় জনতার যে রায় নেয় সেখানকার প্রশাসন সেই ভোট ঠেকাতে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে একটি খসড়া প্রস্তাবনা বিলি করেছিল আমেরিকা। কিন্তু অন্যতম স্থায়ী সদস্য রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করে এই প্রস্তাবনা রুখে দিয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন অভিযোগ করেছে, ইউক্রেন থেকে ক্রিমিয়ার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পেছনে রাশিয়ার ইন্ধন রয়েছে এবং রাশিয়ার সামরিক ও রাজনৈতিক সমর্থন ছাড়া সেখানে গণভোট সম্ভব ছিল না। তারা গণভোটের গোটা বিষয়টিকেই বৈধতা দিতে রাজী নয়। গণভোটের মধ্য দিয়ে ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টার প্রত্যুত্তরে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারির প্রস্তুতি শুরু করেছে জোরকদমে। এই পরিস্থিতিতে এমনকী জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেলের থেকেও এসেছে পাল্টা হুঁশিয়ারি, ‘সরে আসুক রাশিয়া। নইলে কপালে দুঃখ আছে। চরম পরিণতির জন্য তৈরি থাকুক মস্কো’। ভ্লাদিমির পুতিনের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, ‘আমরা কিন্তু নিছক হুমকি হিসেবে একে দেখছি না। মনে রাখা প্রয়োজন, কিছু ঘটলে তাতে ইউরোপের যা ক্ষতি, এককভাবে তার চেয়ে অনেক বড় ক্ষতি রাশিয়ার’। রুশ কর্মকর্তারা পাল্টা বলেছেন, স্বায়ত্বশাসিত ক্রিমিয়ার জনগণের তাদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার রয়েছে এবং এ জন্য তাদের প্রতি মস্কোর সমর্থন রয়েছে। রুশ সংসদও ক্রিমিয়ায় গণভোটের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছে, সেখানকার জনগণ যদি রুশ ফেডারেশনে যোগ দেওয়ার পক্ষে ভোট দেয় তাহলে এটাকে তারা স্বাগত জানাবে এবং তাদেরকে সহযোগিতা করবে। এ কারণে রাশিয়া ক্রিমিয়াকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলতে রাজি নয় এবং রাশিয়ায় যোগ দেওয়ার বিষয়টিকে তারা স্থানীয় জনগণের সিদ্ধান্ত বলে মনে করে।

পশ্চিমী দেশগুলো তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার ঘুঁটি হিসেবে ইউক্রেনকে ব্যবহার করেছে দীর্ঘদিন। ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতির অপসারণ ও নয়া সরকারের প্রতিষ্ঠা এবং ইউক্রেন সঙ্কটের পেছনে যদি চলতি ব্যবস্থার দুর্নীতি ও দমনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ একটা কারণ হয়, তবে অপর কারণটি অবশ্যই দক্ষিণপন্থী নয়া ক্ষমতাসীনদের পেছনে মার্কিন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের লাগাতার মদত। আমরা ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বের ওপর মার্কিন ন্যাটোর খবরদারির চেষ্টা বা রাশিয়ার আধিপত্যবাদের চেষ্টার কোনটিই সমর্থন করি না। ইউক্রেনের জনগণই তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা তার ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টাকে আমরা ধিক্কার জানাই। **- সৌভিক ঘোষাল**

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ২ ও ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : cpimlwb@yahoo.com//deshabrati@gmail.com